মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE. BANIPUR.

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য, এম. এ. বি. টি.

অধ্যাপক—কল্যাণী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

প্রাক্তন অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ)

Library West Bengal Calcutta Road

প্রকাশক :
শ্রীবনোয়ারীলাল চক্রবর্তী
দি নিউ এডুকেশনাল পাবলিসার্স
১২৭এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬

LIBRARY
Date 14. 2. 2002
Acc. No 10397

মূল্য তিন টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

SENIOR BASIC ... COLLEGE BANIPUR.
5540

স্বর্গত মাতৃদেবীর
শ্রীচরণোদ্দেশে—

"—অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন ; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক ; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক ; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্য সম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

—রবীন্দ্রনাথ

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

নিবেদন

মাতৃভাষা মায়ের মুখ থেকে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেরা শিখে থাকে। তথাপি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সার্থক ব্যবহার তাদের শিখতে হয়, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদনও অনুশীলন করতে হয়, লিখন পঠনের সুষ্ঠু কৌশলটি আয়ত্ব করতে হয়।

এই শিক্ষাকার্যটি কত সহজে ও সুন্দরভাবে নির্বাহ করা যায় তাই দেখবার জন্য বহুকাল ধরে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তারি ফলে গড়ে উঠেছে বিস্তৃত মাতৃ-ভাষা-শিক্ষণ পদ্ধতি।

আমাদের দেশের শিক্ষক মহাশয়রাও শিক্ষণতত্ত্ব শিখতে এসে মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুশীলন করেন। তাঁদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থখানি রচনা করা গেল। সুতরাং সাধারণভাবে এটিকে মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি বললেও বিশেষভাবে গ্রন্থখানি বাঙালী ছেলেদের মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি।

গ্রন্থখানিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পঠন-পদ্ধতি অংশ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয় অংশে আছে ছন্দ অলঙ্কার ও ব্যাকরণ। এদের মধ্যে ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা গেল। বাহুল্য বোধে ব্যাকরণ-

5540

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	১—১২
২।	বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ...	১৩—২০
৩।	শব্দভাণ্ডার	২০—২৭
৪।	সাধুভাষা ও চলিত ভাষা	২৮—৩৭
৫।	গল্প বলা ও কবিতা পাঠ	৩৮—৪৮
৬।	পঠন	৪৯—৫৭
৭।	লিখন	৫৮—৬৫
৮।	ব্যাকরণ শিক্ষা	৬৬—৭১
৯।	বানান শিক্ষা	৭২—৮১
১০।	রচনা শিক্ষা	৮২—৮৭
১১।	অনুবাদ শিক্ষা	৮৮—৯৪
১২।	ছন্দ	৯৫—১১৯
১৩।	অলঙ্কার	১২০—১২৭
১৪।	পাঠ টীকা কি ও কেন ?	১—

আলোচনা বর্জন করা হয়েছে। যে কোন স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণেই প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে, গ্রন্থ রচনায় আমার পূর্বসূরী স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের ঋণ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও নানাভাবে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতার ফলে গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ থেকে গিয়েছে সেজন্য সুধীজনের কাছে ত্রুটি স্বীকার করি। পাঠকালে সেগুলি সহজেই সংশোধন করে নেওয়া চলতে পারে বলে তার স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত করলাম না।

গ্রন্থখানিতে কোনভাবে কেউ যদি কিছুমাত্র উপকার পান তাহলেই শ্রম সফল জ্ঞান করব।

স্বাধীনতাদিবস' ৫৯
কল্যাণী (নদীয়া)

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিশু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর মাতৃস্তন্য হতে অমৃত রসধারা গ্রহণ করে যেমন সে তার দেহ গঠন করে, মায়ের মুখ থেকে তেমনি ভাষা গ্রহণ করে তার ভাবসম্পদকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

মাতৃভাষাই মনের অস্ফুট ভাবগুলিকে সর্বপ্রথম পরিস্ফুট করে তুলতে শেখায়, অব্যক্ত প্রকাশ-বেদনাকে সার্থক অভিব্যক্তির স্তরে উন্নীত করে দেয়, অনির্দেশ্য ব্যাকুলতাকে নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়ে থাকে। আত্মিক জগতে, চিন্তার জগতে, ধ্যানের জগতে মানসিক পরিমণ্ডলের জগতে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই মানুষ নবজন্ম লাভ করে, নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করে।

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু যখন এই একান্ত অপরিচিত এক নূতন জগতে এসে প্রবেশ করে তখন থেকেই তার সুরু হয় পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজন প্রচেষ্টা। অপরিচিত অজ্ঞাত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে চলে। তার ফলে শিশুর আত্মিক বিকাশ ঘটতে থাকে সামাজিক জীব হিসাবে।—এই আত্মবিকাশ তার ভাবে ভাবনায়, চিন্তায় ও কর্মে। কিন্তু এই আত্মবিকাশের পদ্ধতিটি কি?—

মাতৃভাষার উদ্দেশ্য

শিশুর বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে একটা

অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আলোড়ন ঘটতে থাকে, তাকে স্পষ্ট করে রূপ দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের ভাষা।—এককথায়, মানুষের অন্তরের ভাবজগৎ আর বাইরের বস্তুজগৎ এই দুয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হল তার ভাষা। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ পরস্পরকে নিকটে টানে—গড়ে তোলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—কিন্তু এই গঠন কার্যের মৌল উপাদানই হল তার ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা—যে ভাষা সে শিক্ষা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পায়নি, পেয়েছে মায়ের মুখ থেকে। আলো বাতাস জলের মতই একান্ত স্বাভাবিক ভাবে এবং অজ্ঞাতসারে এই ভাষা সে সংগ্রহ করেছে।—এই মা শুধু গর্ভধারিণী জননীই নন, জন্মভূমিও বটে।

মাতৃভাষার বিশেষ মূল্য

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জগতের সমুদয় ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, একটা বিশেষ মূল্য আছে। জগতের মানুষ অসংখ্য, তেমনি তাদের মনের ভাব প্রকাশের কৌশলও সংখ্যাতীত। বিচিত্র জাতির বিচিত্র ভাষা। প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু সৌন্দর্য আছে, সাহিত্যও আছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাও হয়ত কিছু আছে, কিন্তু আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে মাতৃভাষার তুল্য আর কোন ভাষাই নয়।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল আত্মবিকাশ। বহুযুগের বহু মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে শিক্ষার মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তার মানসিক সম্পদকে বাড়িয়ে তোলে,

গতযুগের অভিজ্ঞতায় বর্তমান মানুষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর হয় এবং সেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সে রেখে যায় আগামী দিনের জন্য—এমনি করেই হয় সভ্যতার অগ্রগতি।

কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে তা যেমন সুন্দর ও সার্থক ভাবে করা যায়, এমন আর কোন ভাষাতেই নয়। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা।

তাছাড়া মাতৃভাষার আরো একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে—আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে। যে আত্মমর্যাদা বোধ, যে স্বাজাত্যবোধ, যে জাতীয় গরিমাবোধ আমাদের আত্মিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, সেই বোধটি আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাবোধের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কবির ভাষায় বলতে গেলে বাংলাভাষা বাঙালীর কাছে শুধু মাত্র ভাবপ্রকাশের বাহনই নয়, সে হল "মোদের গরব মোদের আশা"।

কোন বাঙালীর জীবনে এই আশা ও গর্বের বিষয়টির মর্যাদা রক্ষিত না হলে অকল্যাণ শুধু সে হতভাগ্যেরই নয় অকল্যাণ বাংলা দেশেরও।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি আলফাঁস দোদের একটি বিখ্যাত গল্প—"দি লাষ্ট লেসন"।

শত্রু সৈন্য ফরাসীদেশ আক্রমণ করেছে। নগরের পর নগর

তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। গ্রামের এক বিদ্যালয়ে শিশুদের পড়াচ্ছেন এক প্রবীণ শিক্ষক। দূরে শত্রু সৈন্যের কোলাহল। অবিলম্বেই দেশ তাদের করতলগত হয়ে যাবে। প্রবীণ শিক্ষক বল্লেন—আর সময় নেই, দেশ পরাধীন হল বলে, আজ আমার শেষ শিক্ষা দিয়ে যাই। বলে যাব, ভুল না তোমাদের মাতৃভাষা, ভুলনা মাতৃভাষার গৌরব। তাহলে দেশ পরাধীন হলেও আবার সব ফিরবে। নইলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।··সৈন্য সামন্ত দিয়ে দেশের সংস্কৃতি বাঁচান যাবে না—সে বাঁচতে পারে যদি মাতৃভাষার মর্যাদা আমাদের অন্তরে চিরঅম্লান থাকে-- শিক্ষকের 'লাষ্ট লেসন' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর গুলিতে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। যে ভাষায় শিশু কথা বলে চিন্তা করে, অন্তরের অস্ফুট ভাবগুলিকে স্ফুটতর করে তোলে, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বেলায় জ্ঞানার্জনের বেলায় তার কোন সাহায্যই শিশু পেত না ; অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সে তা প্রকাশ করতে পারত না।

পরাধীন দেশে বহুকাল ধরে ইংরাজীই ছিল বাঙালী ছেলের শিক্ষার বাহন। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের পঠন পাঠনা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হত। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ খুঁজতে হয় এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায়।

পরাধীন ভারতে মাতৃভাষার দুরবস্থা

পলাশীর প্রান্তরে বণিক ক্লাইভের কূটনৈতিক কৌশলে মানদণ্ড যে কেমন করে অকস্মাৎ রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেই লজ্জাকর কাহিনী আমাদের জানা আছে কিন্তু তার প্রায় শতবর্ষ পরে মেকলে সাহেবের কূটনৈতিক কৌশলে দেশী খাগের কলম যে কেমন করে ধীরে ধীরে বিলাতি ষ্টিল পেনে পরিণত হয়ে গেল সে কাহিনীও কম যুগান্তকারী নয়।

ক্লাইভের হাতে যে রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছিল মেকলের হাতে সাংস্কৃতিক পরাজয়ে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল। দূরদর্শী মেকলে সাহেব এই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যে নয়া কাঠামোটি রচনা করলেন সামান্য অদলবদল করে অদ্যাবধি তাই চলে আসছে।

ইংরাজী শিক্ষার লাভ ও লোকসান

রাজকার্যের সুবিধার জন্যেই এককালে এদেশে ইংরাজী পঠন পাঠনার সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছাত্রেরা শিক্ষালয় থেকে বহুবিধ জ্ঞানার্জন করে ফিরবে এই শুধু লক্ষ্য ছিল না,—পাকা ইংরাজীনবিশ হয়ে ইংরাজের রাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করতে পারবে, সেইটেই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের কোন লাভ হয়নি এমন কথা বলিনে। বাঙালী পৃথিবীর একটি বিশেষ উন্নত এবং সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে পৃথিবীর সারস্বত সম্মেলনে নিজেদের আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার সে অত্যল্পকালের মধ্যেই আত্মস্থ করে নেবার সুযোগ পেয়েছে। বাঙালী এই সুযোগ পরিপূর্ণ

ভাবেই গ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং লাভ কিছু হয়নি এমন নয়, তবে সে লাভটা হচ্ছে লোকসানী কারবারের উপজাত (by-product) লাভ। এই প্রসঙ্গে লোকসানের পরিমাপটাও চিন্তা করতে হয়। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সব কিছু শিখতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। অনেক শিশু বিদেশী ভাষা আয়ত্তি-করণের বৃথাশ্রমে গলদঘর্ম হয়ে জ্ঞানের অমৃতধারায় বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষাও বড় কম উপেক্ষিত হয়নি। এর অপেক্ষাও আর একটা গুরুতর ক্ষতি হয়েছে—দেশবাসীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এদের মধ্যে একটি নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। মেকলের ফিলট্রেসন থিয়োরী অর্থাৎ জ্ঞানের চুঁইয়ে পড়া নীতি ইংরাজী ভাষা জ্ঞানের অপ্রবেশ্য শিলাস্তর ভেদ করে সার্থক হতে পারেনি। তাছাড়া ইংরাজীনবিশদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে সেখানেও একটা পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতির অন্ধ অনুকরণ প্রীতির লজ্জাজনক অবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে

পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী রাজপুরুষেরা আমাদের চিত্তভূমিতে যেভাবে বিজাতীয় মনোভাবের বীজ রোপন করে সাংস্কৃতিক বিজয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন ইংরাজী শিক্ষাকে অবলম্বন করে আজও তা আমাদের মধ্যে টিকে আছে। আজও আমরা অনেকেই দেশকে ভালবাসতে শিখিনি। দেশের

রীতিনীতি দেশের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব আন্তরিক ভাবে স্বীকার করতে পারিনি।

স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে এই অবস্থা অবশ্যই গৌরব জনক নয়।

তাই বলে ইংরাজী ভাষা, তথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা নেই এমন কথা বলছিনে। তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ববিষয় জ্ঞান লাভের পর অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্যেই বিদেশী ভাষার চর্চা করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করি—

"ছোট বেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাদ্য দ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে,—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরাজি শিক্ষায় এটি হইবার যো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে। মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।·· প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎ শক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়—"

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি অপরিণত, সামর্থ্য সামান্য, অভিজ্ঞতা অপূর্ণ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানসিক

খাদ্য গ্রহণের দাঁতের গোড়ায় তেমন জোর হয়নি, সুতরাং এই স্তর অবধি সর্ববিধ শিক্ষা একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই দিতে হবে, তবেই তা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক হবে।—এই একান্ত সাধারণ কথাটা অনেক বিচার বিতর্ক আন্দোলনের ফলে এবং মনীষী সার আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন থেকেই মাধ্যমিক স্তরের সর্বপ্রকার পঠনপাঠনা মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন কি উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজ মাতৃভাষা কোথাও কোথাও আসন লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কিন্তু শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার অবাধ অধিকার আজও স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও মাতৃভাষার অধিকার অপেক্ষা অন্য কোন বিদেশী ভাষার অধিকার জোরালো হবে এমন কথা স্বীকার করা স্বাধীন দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমনটি ঘটেছে বলে নজির নেই।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার দাবী

রাশিয়ার এমন অনেক দেশ আছে কিছুকাল পূর্বেও যাদের ভাষার বর্ণমালা ছিল না—সেখানে আজ তারাও মাতৃভাষাতেই সর্বপ্রকার জ্ঞানের স্বাদ পাবার অধিকারী হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও সমৃদ্ধতর হচ্ছে। আর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলাতে কেন তা সম্ভব হবেনা একথা বোঝা শক্ত।

প্রতিপক্ষের কাছে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—উচ্চতম শিক্ষার উপযোগী, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ কোথায় বাংলা ভাষায়? সুতরাং বাধ্য হয়েই বিদেশী ভাষার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কিন্তু আপত্তিটি কি সত্যই খুব জোরালো?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি প্রণিধানযোগ্য—

"—কথা হইতে পারে বাংলায় এত বই কোথায়? তবে সেই কথাই হউক। বাংলায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা করা যাক। সিণ্ডিকেট সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন তবে দরিদ্র বাঙালী একাজে এখনই নিযুক্ত হয়। ম্যাকমিলান সাহেবকে অনেকদিন অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিতে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায়, ত তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞানবিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মতো সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থান বিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।—"

প্রায় দশ বৎসর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন দেশের

অধিবাসী হিসাবে মাতৃভাষার শিক্ষাদান শুধু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই নয়, আত্মমর্যাদা রক্ষার দিক দিয়েও আজ একান্ত অপরিহার্য।

এই দিক দিয়ে বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা-শিক্ষকেরও একটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিদ্যালয়ে পড়ান হয়—বাংলা ভাষাও পড়ান হয়। বাংলা ভাষার শিক্ষক সব সময়েই মনে রাখবেন তিনি কেবলমাত্র বাংলা ভাষা জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন না, তিনি স্বাধীন জাতির মাতৃভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মর্যাদা জ্ঞানও যদি তিনি ছাত্রদের না শেখাতে পারেন তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। ইংরাজ আমলে বাংলা শিক্ষকের নাম ছিল "ভার্ণাকুলার টিচার", মর্যাদায় তিনি ছিলেন ব্রাত্য। আমল পালটেছে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এখনো তেমন হয়েছে বলে দেখছিনে! বাংলা শিক্ষকের অমর্যাদা বাংলা ভাষারই অমর্যাদা, এবং ভাষার অমর্যাদা স্বাধীন জাতির সুষ্ঠু আত্মবিকাশের পরিপন্থী। এই কথাটি আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

বাংলা-শিক্ষকের দায়িত্ব

ইংরাজের আমল থেকে এদেশে বাংলার নাম চলে আসছে ভার্ণাকুলার। ভার্ণাকুলার শব্দটি কুলীন জাতের নয়। এককালে এটাকে রোম্যানরা ইংলণ্ডে 'স্থানীয় দাসজাতির ভাষা' বোঝাতে চালিয়ে ছিল। আজ অবশ্য অর্থের পীনায়ন ঘটেছে 'মাতৃভাষা'

রূপে। কিন্তু শব্দটির অন্তর্নিহিত অবজ্ঞার সুরটি ইংরাজরা ভুলেছিল বলে ত মনে হয় না।

যাই হোক, বাংলা ভাষা আজ আমাদের মাতৃভাষা হিসেবেই গ্রহনীয়, ভার্ণাকুলার হিসাবে নয়। দেহগঠন কার্যে বিলাতি টিনের দুধ যেমন মাতৃস্তন্যসুধার স্থান গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি মনের গঠন কার্যেও পৃথিবীর কোন ভাষাই মাতৃভাষার স্থান পুরণ করতে পারে না। বিলাতিদুগ্ধনির্ভর শিশুর চেহারাটি প্রদর্শনীতে দেখাবার যোগ্য হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তার আন্তরিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তে দেরী হয় না। বাঙালী এত শিখেও তাই এতদিনে জগতের কর্মশালায় নকল নবিশের পদ থেকে উন্নতি লাভ করতে পারল না।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করি—

"—কোন কোন ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে' বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না, ঢেঁকিরকাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারু রূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলেনা। এজন্য যে খুসি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে, সে কেন বিস্মিত হয়? মানুষের মনকে যদি মনরূপে

বাড়িতে দিতে তবেই ত মধ্যে মধ্যে ওরজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত। কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া শেখা বুলি আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি জার্মানি যখন ফরাসী লিখিত তখন কি সে ফরাসী ভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল ·····ফ্রেঞ্চ এবং জার্মানিদের ভাষা ভাব দেশের প্রকৃতি ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে, আমাদের সহিত ইংরেজদের কি তাহার শতাংশও আছে? আমারা সেই ইংরেজি শিখিয়া সেই ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি অধ্যাপকের নিকট কি ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া ধিক্কার দাও কেন?"

সৌভাগ্যের বিষয়, আজ আমাদের কাঠের পা দূর করে দিয়ে নিজের পদগৌরবে নৃত্য করবার দিন এসেছে। এই নৃত্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনেই নয়, রাষ্ট্রীয় কার্যের ব্যাপক ক্ষেত্রেও আজ বেজে উঠেছে নৃত্যের বাদ্য।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যিক চর্চা কেন অতি প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে আলোচনা কর। (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৫)

২। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? গত দশ বৎসরে এই গুরুত্ববোধের পরিবর্তন হইয়াছে কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে হইবে। (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৭)

———

বাংলাভাষার উৎপত্তি সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের হাসিকান্না আনন্দ বেদনার অনুভূতিকে রূপ দিয়েছি, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের অন্তর্জগতের যোগাযোগ স্থাপন করেছি, গদ্যপদ্যের অপরূপ সাহিত্য-রচনা করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গৌরবজনক আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং এই ভাষায় উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া আমাদের স্বাভাবিক।

বাংলায় সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দ অর্থাৎ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য দেখে অনেকে মনে করেন বাংলাভাষা হয়ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা সংস্কৃত থেকেই সোজাসুজি উৎপন্ন হয়েছে। কথাটা এক হিসাবে সত্য হলেও সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাবে এটি ঠিক নয়। যাইহোক একেবারে গোড়ার কথা থেকেই সুরু করি। নদীর উৎস সন্ধানে বের হয়ে যেমন ক্রমশ দুর্গম পার্বত্য উচ্চভূমিতে গিয়ে উপনীত হতে হয়, ভাষার উৎস সন্ধানে গিয়েও তেমনি সুপ্রাচীন কোন এক ইতিহাসপূর্ব যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুমাননির্ভর দুর্গম ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছুতে হয়।

আজ পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষী অসংখ্য জাতির বাস, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের গবেষণার পথ ধরে এগিয়ে চললে দেখা যাবে

এক একটি মৌলিক ভাষা থেকে স্থানকাল ভেদে অনেকগুলি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

পৃথিবীর এমনি একটি মৌলিক ভাষার অস্তিত্ব অনুমান করেন পণ্ডিতেরা ইন্দোইয়োরোপীয় জাতিদের ভাষা। এই জাতির বাসস্থান সম্ভবত ছিল ইউরেশীয়া ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে কোন এক অঞ্চলে (অবশ্য এই বাসস্থান নির্ণয় নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে প্রচুর)। এই জাতিই হল প্রাচীন আর্য জাতি।

ভারতীয় ভাষার আদিকথা

তারপর জনসংখ্যাবৃদ্ধি-জনিত খাদ্যাভাবের ফলেই হোক বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই হোক আর্যেরা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর চারিদিকে—কালক্রমে স্থানকালপাত্র ভেদে তাদের মুখের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গেল—সৃষ্টি হল নূতন নূতন ভাষা। পণ্ডিতেরা এদের মোটামুটি দশটি ভাগে ভাগ করেন—কেলটিক্, গ্রীক, ইটালীয়, জার্মানীয়, তুখারীয়, হিট্টাইট, আর্মেনীয়, আলবেনীয়, শ্লাভীয় এবং ইন্দোইরানীয়।

এদের মধ্যে ইরাণে উপনিবেশকারী আর্যদের ভাষা ইন্দো-ইরানীয় থেকেই ভারতীয়-আর্য-ভাষার জন্ম। পরবর্তী এক যুগে একদল আর্য ইরাণ থেকে ক্রমশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এসে উপস্থিত হল। কালক্রমে এদের মুখের ভাষা যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছিল তারি সাহিত্যিকরূপের পরিচয় আমরা পাই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। ক্রমশ আর্যগণ যখন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন এই বিশাল ভূখণ্ডে

তাদের পূর্বতনভাষা আর অবিকৃত রাখা সম্ভব হল না। তার উপর স্থানীয় অনার্যগণও এই ভাষা গ্রহণ করাতে ভাষার উপর তাদের উচ্চারণ রীতির প্রভাবও পড়েছিল কম নয়।

এই ভাবের প্রাকৃতজনের প্রভাবান্বিত বিকৃত আর্যভাষাই হল প্রাকৃত ভাষা।

ভাষাতত্ত্বে এই ভাষার নাম হল—মধ্যযুগীয় ভারতীয়-আর্য্য-ভাষা—এর ব্যাপ্তি খৃঃ পূঃ ৬০০ বছর থেকে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে আমরা যে সংস্কৃতভাষার পরিচয় পাই তাও এই প্রাকৃত যুগেই উৎপন্ন হয়েছিল। এই সংস্কৃত কোন দিনই আর্যদের মৌখিক ভাষা ছিলনা—এটা একটা কৃত্রিম সংস্কৃত ও বাংলার লেখ্য ভাষা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের

সম্পর্ক

আর্যেতর জাতির প্রভাবে বৈদিকভাষায় দ্রুত বিকৃতি ঘটছিল দেখে শিষ্ট জনের জন্য একটা বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন অনেকে। তার ফলে ব্যাকরণের সূত্রাদি নির্মাণপূর্বক তাকে সংস্কার করে একটি নতুন ভাষা তৈয়ারী করা হয়—তাই তার নাম সংস্কৃত। এই ভাষা-সংস্কার কার্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হল তক্ষশীলাবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত পাণিনির।

যাইহোক শিষ্টজনের লেখ্যভাষায় সংস্কৃতের ব্যবহার চলল বটে কিন্তু জনসাধারণের মুখে মুখে চলল তার একটা বিকৃত রূপ—প্রাকৃতজনের উচ্চারণবৈকল্যের ফলে এর উৎপত্তি বলে এই জাতীয় ভাষার নাম দেওয়া হল প্রাকৃত।

অবশ্য সংস্কৃতের যেমন একটা সর্বভারতীয় রূপ অবিকৃত

আছে প্রাকৃতের তা নেই এবং তা থাকা সম্ভবও নয়। ভারতবর্ষ বিশাল ভূখণ্ড। এর বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটল। এইসব ভাষার স্থিতিকাল হল একশো থেকে পাঁচশ' খৃষ্টাব্দ—আর এদের নাম হল অঞ্চলভেদে শৌরশেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী, এবং অর্দ্ধমাগধী—এইভাবে প্রাকৃতভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করল। তবে এই ভাষাও বেশীদিন নিজ স্বরূপ অবিকৃত রাখতে পারেনি। আর্যেতর জাতির ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণে প্রাকৃত ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এই পরিবর্তিত প্রাকৃত ভাষার নাম অপভ্রংশ। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন অপভ্রংশের রূপও হল বিভিন্ন। এবং সেইসব বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই ভারতের বর্তমান প্রাদেশিক ভাষা সমূহের জন্ম হয়েছে।

মগধ (বিহার) অঞ্চলে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। এ প্রায় হাজার বছর পূর্বের ঘটনা—

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

মূল সংস্কৃত থেকে পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর বেয়ে কিভাবে বর্তমান বাংলাভাষা উৎপন্ন হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	বর্তমান বাংলা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	সাঁঝ	সাঁজ
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইন্দারা

কৃষ্ণ	কন্হ	কন্হ	কাহ্ন	কানাই
ভবতি	হোতি	হোই	হোই	হয়

বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদ নামক নেপাল থেকে আনীত প্রায় হাজার বছরের পুরোণো একখানি পুঁথিতে। চর্যাপদের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা খুবই কম। পরবর্ত্তীযুগে বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করতে থাকে! তারপর মুসলমানগণ এদেশে আসার পর এই ভাষায় আরবী ফারশী শব্দ এসে জোটে। অবশেষে পর্তুগীজ ফরাসী ও ইংরেজরা আসার ফলে প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ ও বাংলা শব্দ ভাষায় এসে জমতে লাগল। ওদের মধ্যে ইংরাজরা আবার সুদীর্ঘ দেড়শ বছর ধরে এই দেশে রাজত্ব করে গিয়েছে—তার ফলে শুধু ইংরাজী শব্দই নয় ইংরাজী ভাষারীতি, বাক্যগঠন প্রণালী ছেদ বিন্যাস প্রভৃতি অনেক কিছুই এসে গিয়েছে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

মোট কথা বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি উৎপন্ন হয়নি বটে কিন্তু সংস্কৃত উৎস থেকেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে বললে ভুল বলা হবে না। সংস্কৃতকে বাংলাভাষার জননী বলা না গেলেও পিতামহীস্থানীয়া অবশ্যই আমরা মনে করতে পারি। মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলাভাষার দেহ গঠন হয়েছে বটে কিন্তু দেহসৌষ্ঠব ঘটেছে পিতামহীর রত্নপেটিকা থেকে পাওয়া অপূর্ব

ঐশ্বর্যমণ্ডিত শব্দ অলঙ্কারের দ্বারা। তাছাড়া প্রাণধর্মের দিক দিয়েও সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী।

সুতরাং বাংলাভাষা পঠনপাঠনা করতে গেলে সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। বাংলাভাষাকে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষারূপে গ্রহণ করবার চেষ্টা যতই হোক, তার প্রাণ-শক্তিটি কিন্তু নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে। তাই বাংলাভাষার জ্ঞানটি সুসম্পূর্ণ করতে হলে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যথোচিত থাকা চাই।

বাংলার ছাত্রের সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বাংলার ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা দু'দিক দিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি—এক, ভাষার দিক, অপর ভাবের দিক।

ভাষার দিক থেকে বলা যায় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান বাংলা শব্দার্থবোধ ও মর্মগ্রহণে সাহায্য করে বাংলার শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ গঠন করবার ক্ষমতা সংস্কৃতের অপরিসীম—সেই সব নবগঠিত শব্দ সম্ভার বাংলার শব্দভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করছে—সংস্কৃতের জ্ঞান না থাকলে এই ভাবে শব্দ গঠন করবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিভাষা সংকলনে সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য। নূতন নূতন শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি বিধান অনুযায়ী নির্মান করেই পরিভাষা তৈয়ারী করা হচ্ছে। সংস্কৃতের সঙ্গে যোগসূত্র কেটে দিলে বাংলায় কি করে তা সম্ভব হবে?

তৃতীয়তঃ—বাংলা ব্যাকরণ এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক বিধি বিধান—যথা সন্ধি, সমাস, বিভক্তি, কারক, প্রভৃতি বাংলা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সংস্কৃতভাষা জ্ঞানটি ভালভাবে থাকলে তবেই বাংলাভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ আমরা আশা করতে পারি। তৎসম শব্দের বর্ণাশুদ্ধিও একমাত্র সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের দ্বারাই দূরিভূত করা যায়।

মোট কথা, বাংলায় শব্দভাণ্ডার, শব্দগঠনরীতি, প্রয়োগ কৌশল, ভাষা ব্যবহারের আঙ্গিক প্রকরণ সবই সংস্কৃতানুগ—সুতরাং বাংলাভাষার ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় কথা ভাবের দিক—জাতিগত হিসাবে আমরা বাঙালীরা ভারতীয় আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী। সভ্যতার যাবতীয় চিন্তাধারার পরিচয় একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির যে নিদর্শন তার কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় পেতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য।

এককথায় প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির সঙ্গে আজও যে আমরা নিজেদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছি সেই সূত্রটি হল সংস্কৃত ভাষা।

সুতরাং ভাবের দিক থেকেও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

COLLEGE ANIPUR

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্কটি বুঝাইয়া দাও। বাংলা পড়িতে ও পড়াইতে সংস্কৃতের জ্ঞান কতখানি সহায়তা করে?

কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৪

২। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বিবৃত কর।

শব্দভাণ্ডার

ভাষার প্রধান সম্পদ হল তার শব্দ; শব্দের ভাণ্ডার যার যত সমৃদ্ধ সে ভাষাও মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের তত উপযোগী। সভ্যতার পথে আমরা যত এগিয়ে এসেছি ততই আমাদের মননশক্তি বেড়েছে, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা বেড়েছে। তার ফলে একদিকে যখন নূতন নূতন শব্দ গঠন করেছি, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ভাষা থেকে কত বিচিত্র শব্দ আত্মসাৎ করে আমরা আমাদের শব্দের ভাণ্ডার স্ফীত করে তুলেছি। বাংলা ভাষার শব্দ সংখ্যা আজ প্রায় সোয়া লক্ষ।

শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করবার উপায় দুইটি—এক হল ধাতুতে বা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নূতন নূতন শব্দ গঠন করা এবং অপরটি হল সোজাসুজি অপর ভাষা থেকে শব্দকে আত্মসাৎ করে নিজের করে নেওয়া। প্রথম পন্থায় অগ্রণী হল সংস্কৃত ও

35 13

গ্রীক ভাষা আর বিদেশী ভাষা আত্মসাৎ করায় ইংরাজী ভাষার জুড়ি নেই। উভয় উৎস থেকেই শব্দ গ্রহণ করে বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে—বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে প্রচুর নূতন নূতন বিদেশী শব্দ এসে জুটেছে সেখানে।

বাঙালী জাতি যখনই অন্য ভাষাভাষী বিদেশী জাতির সঙ্গে মিলেছে তখনই উভয়ের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক মিলন স্থাপিত হয়েছে এবং তার ফলে তাদের বহু শব্দ বাংলা শব্দ-কোষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং এই দিক দিয়ে বাংলা শব্দপুঞ্জকে মোটামুটি দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে,—মৌলিক আর আগন্তুক।

মৌলিক শব্দ হচ্ছে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তরের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষা প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত থেকেই উৎপন্ন তাই সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দ গুলিই হল বাংলা ভাষার মৌলিক শব্দ। এই মৌলিক শব্দ গুলিকে আবার উৎপত্তির স্তর হিসাবে তৎসম অর্দ্ধতৎসম ও তদ্ভব, এই কয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এ ছাড়া রয়েছে দেশী শব্দ। আর্যেতর জাতির ভাষা থেকে যেগুলি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলা হয়।

14.2.2002
10397

এগুলি বাংলা দেশবাসীর নিজস্ব শব্দ হলেও সংস্কৃতের ধারা বয়ে আসেনি বলে এগুলিকে বাংলার মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করে আগন্তুক বলেই ধরা হয়।

সুতরাং প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দ পুঞ্জকে প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যথা মৌলিক শব্দ—তৎসম অর্দ্ধতৎসম ও তদ্ভব, এবং আগন্তুক শব্দ—দেশী ও বিদেশী।

তৎসম

তৎসম শব্দের অর্থ হল তৎ=তাহা (সংস্কৃত) সম=সমান, অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ, যথা বৃক্ষ, পৃথিবী, জল, ফল, কৃষ্ণ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি—উচ্চারণ যাই হোক, বানানে এগুলি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ।

অর্দ্ধ তৎসম

অনেক তৎসম সংস্কৃত শব্দ বাঙালীর জিহ্বায় স্বরভক্তি বা স্বরসঙ্গতির প্রভাবে কিছু কিছু বিকৃত হয়ে পড়েছে। এই বিকৃত তৎসম শব্দকে বলা হয় অর্দ্ধতৎসম শব্দ। বাংলায় আগত বহু সংস্কৃত শব্দ এই ভাবে অর্দ্ধতৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। যথা—নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, কৃষ্ণ>কেষ্ট, পুরোহিত>পুরুত, চন্দ্র>চন্দর, সূর্য>সুজ্জি, জ্যোৎস্না>জোছনা, মহার্ঘ>মাগ্‌গি, মহোৎসব>মচ্ছব ইত্যাদি।

তদ্ভব

তদ্ভব বা তৎ-ভব অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে জাত। যে সব শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর বেয়ে কিছু পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে এসে সঞ্চিত হয়েছে তাদের বলা

হয় তদ্ভব শব্দ। এই তদ্ভব শব্দই হল বাংলা ভাষার প্রধান সম্পদ। বাংলার ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০টি শব্দই হল তদ্ভব। যথা—

কার্য>কজ্জ>কাজ, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, খাদ্য>খজ্জ>খাজা, ইন্দ্রগার>ইন্দাআর>ইদাঁরা, কৃষ্ণ>কন্হ>কানু, ষোড়শ >ষোলহ>ষোল ইত্যাদি।

এ ছাড়া বাংলায় এমন আরো কতকগুলি তদ্ভব শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মূল সংস্কৃত নয়। কিন্তু সংস্কৃতের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তর বেয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। এ শব্দগুলি থেকে প্রমাণ হয় বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করতে সংস্কৃত ভাষাও এককালে কম পটু ছিল না। এই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত ভাণ্ডারে বিদেশী বা আগন্তুক পর্য্যায়ের কিন্তু আমরা সংস্কৃতের মারফতে পেয়েছি বলে এদের মৌলিক পর্য্যায়ে ধরা হল। যথা—

(তামিল) মুট্টৈ—(সং) মুটক—মুডঅ—মোট

(গ্রীক) দ্রাখ্মে—(সং) দ্রম্য—দম্মে—দাম

(পহলবী) পোস্ত—(সং) পুস্তিকা—পুত্থিআ—পুথি

(তুর্কী) তিগির—(সং) ঠক্কুর—ঠাকুর ইত্যাদি।

২। আগন্তুক ঃ—

(ক) দেশী—প্রাচীনকালে আর্যেরা যখন আর্য ভাষা নিয়ে এদেশে এলেন তখনও এদেশে আর্যেতর একটা জাতি ছিল এবং তাদের ভাষাও ছিল। বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফলে

মেলামেশার ফলে এই আর্যেতর জাতির অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে কিছু দেশী ভাষার শব্দও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও একেবারে নগণ্যও নয়। যথা—ঢেঁকি, ডিঙ্গি, ঝাঁটা, ঝিঙে, তেঁতুল, চাউল, ডাঙ্গা, ঢোল, ডাঁসা, ডাব ইত্যাদি। এই শব্দগুলি অজ্ঞাতমূল অর্থাৎ কোন ধাতু থেকে উৎপন্ন বা কোন প্রত্যয় যোগে গঠিত তা আজ আর বলা সম্ভব নয়।

দেশী

(খ) বিদেশী ঃ—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতের সঙ্গে রাজ-নৈতিক ও বানিজ্যিক যোগাযোগের ফলে বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের আমদানী বড় কম হয়নি।

১৩ শতকের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ বিদেশী মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে তারপর ১৬ শতকে অর্থাৎ মোগল যুগে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যে মোগল সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে, তার ফলে আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পার্শীভাষার প্রভাব পড়ে যথেষ্ট। এই প্রভাব ১৯ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরাজ যুগের প্রথম আমল পর্যন্ত অব্যাহত ভাবেই বেড়ে চলেছিল।

বাংলার শব্দভাণ্ডারে পার্শী শব্দের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

পার্শীভাষায় বেশ কিছু আরবী শব্দও আছে তুর্কী শব্দও

আছে। পার্শী মারফৎ সেগুলিও বেমালুম বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে আপনার স্থান করে নিয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে সামান্য কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করি—

পার্শী—মালিক, শিকার, খাজনা, আবাদ, দারোগা, আসামী, ইয়ার, কামান, কারখানা, কারিগর, উকীল, নালিশ, আয়না, কলম, দোয়াত, খাতা, চশমা, জমিদার, জায়গা, তাজা, দোকান, বাগান ময়দা, ময়দান, রসদ, রাস্তা, চরখা, শিশি—ইত্যাদি।

আরবী—আইন আদালত, আক্কেল, কেচ্ছা, খবর, খাবার, গরজ, তামাসা, তারিখ, দলিল, গরম, ফৌজ, মালিক, হুজুর—ইত্যাদি।

তুর্কী—আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কুলি, চাকু বোচকা, লাস, চকমকি, ইত্যাদি।

পোর্তুগীজরা ১৬ শতকে বাংলায় আসতে সুরু করে। তারাও কিছু শব্দ বাংলার ভাণ্ডারে জমা দিয়ে গিয়েছে।

যথা—আনারস, আতা, তামাক, চাবি, তোয়ালে, বালতি, কামরা, গুদাম, পেঁপে, কপি, বোতল—ইত্যাদি।

ইংরাজী—১৮ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ইংরেজের অধীন হল। তারপর থেকে শিক্ষাদীক্ষায় সামাজিক আচার আচরণে, শাসনব্যবস্থায় ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব কেমন ব্যাপক ভাবে যে বাংলায় জাতীয় জীবনকে আচ্ছাদিত করে চলেছে তার পরিচয় আজ কারো অজানা নেই। অসংখ্য ইংরাজী শব্দ

আমরা ভাণ্ডারজাত করে ফেলেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ অল্প কয়েকটি শব্দ এখানে উল্লেখ করি—উল, উইল, কালেক্টর, কমিটি, কলেরা, গেট, গ্লাস, চেয়ার, টেবিল, টিন, ডিস, ডাক্তার, নম্বর, নোট, নিব, পিন, পকেট, কোট, প্যাণ্ট, পেন্সিল, পাশ ফেল, মাষ্টার, মাইল, মিনিট, টিকিট ইত্যাদি।

আবার অনেকক্ষেত্রে মূল ইংরাজী শব্দের তদ্ভবরূপ বাংলা শব্দের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে তাদের হঠাৎ চেনাই দায় যেমন—

লাট (Lord), লণ্ঠন (Lantern) গেলাস (Glass) আস্তাবল (Stable) হাঁসপাতাল (Hospital) গারদ (Guard) সান্ত্রী (Sentry) ইত্যাদি—

অনেক ইংরাজী শব্দ আবার বাংলা ভাষার উপসর্গের কাজ করে। যেমন—ফুল (ফুলমোজা, ফুল হাতা) হাফ্ (হাফ হাতা, হাফ ছুটি), হেড (হেডপণ্ডিত, হেড মিস্ত্রী) ইত্যাদি। দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের সাহচর্যে শুধু যে ইংরাজী শব্দই আমরা পেয়েছি তা নয়, ইংরাজী চিন্তাধারাও আমরা কম পাইনি, তার ফলে আমাদের বাক্য গঠন রীতিতেও ইংরাজী প্রভাব পড়েছে প্রচুর—

Golden oppertunity বলতে সুবর্ণসুযোগ, obliged বলতে বাধিত, Lions share বলতে সিংহভাগ—এসব আজ হামেসাই দেখা যাচ্ছে।

বিদেশী শব্দের মধ্যে—

ওলন্দাজ ঃ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ, ইসক্রুপ ইত্যাদি।

ফরাসী—কার্তুজ, কুপন, ফিরিঙ্গী ইত্যাদি।

চীনা—লিচু, চা, তুফান···

জাপানী—রিকসা, যুযুৎসু,

বর্মী—লুঙ্গি,

মালয়ী—গুদাম, সাগু

চিনা—চিনি, চা, ইত্যাদি।

এছাড়া ভারতীয় অন্যান্য আর্যভাষাগুলি থেকেও বাংলায় অনেক শব্দ আমদানী হয়েছে। যথা—

হিন্দুস্থানী—বাণী (বানাবার মূল্য), পুরি

পাঞ্জাবী—চাহিদা, শিখ

গুজরাটী—হরতাল ইত্যাদি।

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন শব্দ এসে বাংলার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এইভাবে বাংলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

১। যে যে শ্রেণীর শব্দ লইয়া বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠিত উদাহরণ সহকারে তাহাদের পরিচয় বিবৃত কর—। আদর্শ বাংলা চলিত ও সাধু ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের প্রয়োগে কোনও অনুপাত রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব কি ?

—(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৩)

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

প্রত্যেক দেশেই ভাষার দুটো রূপ—একটা বাচননির্ভর এবং আর একটা লিখননির্ভর। বাচননির্ভর ভাষার স্থান কাল কেবল বর্তমানের রেখায় সীমিত, বক্তার সম্মুখস্থ উপস্থিত ব্যক্তিমাত্র তার উদ্দীষ্ট।—কিন্তু লিখননির্ভর রচনার ব্যাপ্তি আরো অনেক বেশী। অনুপস্থিত ব্যক্তি ও অনাগত কালকে সম্মুখে রেখে সেই রচনার সৃষ্টি। সুতরাং সেই দুই জাতের ভাষার পার্থক্য অনিবার্য।

মুখের ভাষা বদলে যায় একস্থান থেকে আর একস্থানে—সামান্য ৫০।৬০ মাইল তফাতেই।…এই হিসাবে বাংলাদেশে বাংলাভাষা ভাষীদের মধ্যেই যে কত মুখের ভাষা বা 'ডায়ালেক্ট' প্রচলিত আছে তার আর ঠিক নেই। ভাষাতত্ত্ববিদেরা এইসব ডায়ালেক্টকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। রাঢ়-বা পশ্চিমবঙ্গ, বাঙ্গালী বা পূর্ববঙ্গ, বরেন্দ্রভূম বা উত্তর বঙ্গ, ঝাড়খণ্ডী বা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ এবং কামরূপ বা উত্তর-পূর্ববঙ্গ এই পাঁচ অঞ্চলের বাক্য-প্রয়োগ ধারাকে বাংলার পাঁচটি প্রধান ডায়ালেক্ট বলে ধরা হয়েছে।

এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে অপ্রচলিত, হয়ত বা অবোধ্যও। তাই লেখ্যভাষায় সর্বজনবোধ্য অর্থাৎ সমস্ত বাঙালী বুঝতে পারে এমন একটা রূপ দিতে হয়—যে রূপটি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের নয়।—সেই হল সাধুভাষা।

ভাষার এই, সর্বজনবোধ্য মার্জিত এবং সৌন্দর্যশালী রূপই হল লিখিত ভাষার রূপ।

মুখের কথায় আমাদের দৈনন্দিন জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় আর লেখার কথায় আমাদের সৌন্দর্য পিপাসু মন সাহিত্যসৃষ্টি করে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথীর দিকে তাকিয়ে।

এই ত হল সাধু আর চলিত ভাষার সূচনার কথা, উৎপত্তির কথা। বাংলার এই দুটি ধারার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে এ'দুটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। (১৬ শতকের মাঝামাঝি লেখা একটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করি—

"তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে—"...রচনার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার তখনও খুব বেশী হয়নি। তারপর সাহিত্যের ভাষায় ক্রমে ক্রমে যত সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করতে লাগল ততই দুই ভাষার রীতির মধ্যে প্রভেদ লাগল বাড়তে।

অবশ্য লিখিত রূপের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। প্রাচীন কালে (১৮ শতক অবধি) বাংলাভাষার সাহিত্য সবই প্রায় কবিতায় রচিত হত। গদ্যের কোন স্থানই ছিলনা বলা যেতে পারে। ১৮ শতকের শেষভাগে বা ১৯ শতকের প্রথম ভাগে যখন থেকে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হতে সুরু হল, লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রচলন হল সেইদিন থেকে লেখ্যরূপের ইতিহাস সুরু।

এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাস আলোচনা করবার প্রয়োজন নাই, তবে সংক্ষেপে এইটুকু শুধু উল্লেখ করতে পারি যে সেদিন গদ্যের জন্মটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টির স্বাভাবিক আবেগে তা মানুষের হৃদয় থেকে আপনি উৎসারিত হয়নি—হলে সে ভাষা হয়ত এতটা কৃত্রিম হত না। উনিশ শতকের গোড়ায় সাহেবদের বাংলা শেখানর জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন হল এবং এই কাজের ভার পড়ল পণ্ডিতদের উপর। পণ্ডিত মানেই সংস্কৃত পণ্ডিত,—যে গুণে তাঁদের খাতির সেই গুণের প্রতি তাঁরা যথেষ্টই অবহিত। সুতরাং বাংলা গদ্যের ভাষা সংস্কৃত সন্ধি সমাস এবং অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ সম্ভারে ভরে উঠল। দৃষ্টান্ত দিই—

সাধুভাষা

"...যদ্যপি অন্যোন্যে বাধ্যবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজন বিশেষে সমবায়ে তৈলবর্ত্তিশিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির ন্যায় অর্থসিদ্ধি হইতে পারে।—" (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)

বলাই বাহুল্য মুখে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে এর ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর। এই প্রথমপ্রসূত বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতের কনিষ্ঠ সহোদরা বলে চিনে নিতে কারো কষ্ট হয় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও বাংলা গদ্যসৃষ্টির কার্যে বিশ্রুতকীর্তি বিদ্যাসাগর মশাইও প্রথম দিকে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার একটু নমুনা দিচ্ছি—

—উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল ফেনানিচয় চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি-নক্র-চক্র-ভীষণ-স্রোতস্বতী-পতি-প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল—

এই ছিল তখনকার গদ্য লেখার অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে সখেদে বলেছেন—'লোকে বুঝুক না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি'—"

এইবার চলতি ভাষার অবস্থা বলি। আগেই বলেছি চলতি ভাষা হল মুখের ভাষা—সুতরাং স্থান ভেদে প্রচুর ভেদ। তাহলে সাহিত্য রচনায় কার দাবী অধিক বলে মানা হবে? লেখকেরা আপন আপন জেলার ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করলে ত মহা বিভ্রাট বাধবে। কে কার লেখা পড়ে বুঝতে পারবে? কোনও একটি বিশেষ ডায়ালেক্ট ধরে যদি লিখতে হয় তবে সেটি কোন অঞ্চলের ডায়ালেক্ট—যেটি সবাই মানবে সাহিত্যের ভাষা বলে।

চলতি ভাষা

এর উত্তরে বলা যায় সাংস্কৃতিক প্রাধান্যেই ভাষার প্রাধান্য এনে দেয় সকল দেশেই।

বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীই আর্য সংস্কৃতির মেরুমজ্জা। ("ভাগীরথী উভকূল, বারাণসী সমতুল"—এই প্রবাদ বাক্যে ভাগীরথী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব যে সারা বাংলায় স্বীকৃত তারি প্রতিধ্বনি। তাছাড়া নবদ্বীপ সুপ্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল—সুতরাং এই অঞ্চলের ভাষা বিদগ্ধজনের ভাষা বলেই

সারা বাংলায় বহুকাল ধরেই আদৃত। তারপর কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতিই হল বাংলার আদর্শ সংস্কৃতি অনুকরণীয় সংস্কৃতি। তাই 'নদে শান্তিপুরের' ভাষাই তখন শিষ্ট ভাষা মিষ্ট ভাষা বলে গৃহীত। তারপর ইংরাজ-যুগে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি আরো একটু দক্ষিণে সরে নব রাজধানী কলকাতায় চলে এলো। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপুল আকর্ষণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিতজন এই কলকাতায় এসে পড়লেন। ফলে কলকাতায় চলতি ভাষার একটা সার্বজনীন আবেদন তৈরী হয়ে উঠল। এই চলতি ভাষার সাহিত্যোপযোগিতার প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলালে'। বঙ্কিমচন্দ্র ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—"এতদিনে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল, বাংলা সাহিত্যের মূলে জীবন-বারি নিষিক্ত হইল—" এই যুগান্তকারী গ্রন্থের একটু নমুনা উদ্ধৃত করি "—শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমেই পেকে উঠতে পারে তখন কুকর্মে মন না দিয়া সৎকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়; কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা—"

কোন অঞ্চলের কথিত ভাষা আদর্শ ?

অবশ্য "আলালের ঘরের দুলাল" যে খুব সার্থক সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। ভাষার মধ্যে সাধু, চলিত ও গ্রাম্য সব রকমের শব্দই

মিশ্রিত হয়েছে—তা'সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অনেক।

সাধুভাষার কঠোর বন্ধন শিথিল করে আলালী ভাষা অনেকখানি এগিয়ে এল চলিত ভাষার দিকে। এরপর আরো খানিকটা এগিয়ে এল কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"। হুতোমে মৌখিক ক্রিয়াপদের অজস্রতা উল্লেখযোগ্য। যথা—

"প্রলয় গর্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি এখন সময় নদে অঞ্চলের মুহুরী বল্লে—"

এর পর থেকে কলকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হতে লাগল। প্রথম প্রথম পণ্ডিতদের কাছ থেকে বাধা বড় কম আসেনি, কিন্তু এই নবভাষা তার প্রাণধর্মের প্রাচুর্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এইখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লিখিত ভাষার যে আদিরূপের উল্লেখ করেছি সেইখানেই সে যে দাঁড়িয়ে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তার সংস্কৃত ভঙ্গীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সে উপস্থিত হয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় দুয়ারে। বাংলা গদ্যের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের লিখিত রূপও স্বচ্ছন্দ সাবলীল হয়ে উঠল এ'ত বলাই বাহুল্য। চলিত ভাষার তুলনায় এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তৎসম শব্দের প্রাধান্য এবং ক্রিয়া সর্বনামের সাধু রূপ।

সাধুভাষার রূপান্তর

পরে কথা-শিল্পী লেখকবৃন্দের হাতে এসে এই লেখ্য ভাষাও অনেকটা অগ্রসর হয়ে এল মুখের ভাষার কাছে। রচনার মধ্যে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করে ভাষায় মিষ্টত্ব আনবার চেষ্টা চলতে লাগল। সাধু ভাষার এই ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি নমুনা দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

(১) বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) বাঁশের নলটি তাঁহার বড়ই সাধের জিনিষ ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন সেইখানে এই সখের জিনিষটি ক্রয় করেন।

—(সঞ্জীবচন্দ্র)

(৩) অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার মন বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। (শরৎচন্দ্র)

(৪) সন্ধ্যা হইয়াছে! মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেল গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপর জাগিয়া আছে, বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ)

এরপর কথ্য-ভাষার উন্নয়নে আর একজন বিখ্যাত এবং নির্ভীক সাহিত্যিকের নাম করেই প্রসঙ্গ শেষ করি—ইনি বীরবল নামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী। ইনি গুরুগম্ভীর সাহিত্যেও চলিত ভাষা এবং চলিত রীতি ব্যবহার করে তার শক্তিমত্তা ও স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রকাশ-মানতা যে কত বেশী তা প্রমাণ করলেন। এঁর চলতির মধ্যে কেবল সর্বনাম আর ক্রিয়াগুলোই ছিল কলকাতা অঞ্চলের চলতিরূপ কিন্তু শব্দসম্ভারের অধিকাংশই সাধু তৎসম শব্দ, যথা—

চলিত ভাষার রূপান্তর

"আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে ততটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ—"

রবীন্দ্রনাথ এই পথে শেষদিকে চলতি ভাষার যে অদ্ভুত শক্তি ও সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। "তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক। কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

(শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ)

বর্তমানে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করব যে সাধুভাষায় প্রচুর তৎভব দেশী-বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে চলতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর চলতি ভাষাও প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার

করে গ্রাম্যতা পরিত্যাগে সাধুভাষার নিকটবর্তী হয়ে পড়ছে। পার্থক্যের ব্যবধান ক্রমশই আসছে কমে।

বর্তমানে এই দুই রীতির মৌলিক প্রভেদ হচ্ছে একমাত্র ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের রূপে! যেমন, যাইতেছিল—যাচ্ছিল, দেখিতেছে—দেখছে, করিতেছিলাম—করছিলাম>লুম>লেম···তাহার—তার, তাহাকে—তাকে, তাহাদিগের—তাদের, কেহ—কেউ ইত্যাদি। কতকগুলি অব্যয় শব্দও চলিত ভাষায় পৃথক,—থেকে হতে, দিয়ে, দরুণ, বাবদে, ইত্যাদি···তাছাড়া বাংলাভাষায় যেসব রাশি রাশি বিশিষ্টভাবার্থক বাগধারা প্রচলিত আছে তার যথাযোগ্য স্থান চলিত ভাষায়। সাধুভাষায় তাদের অধিকাংশই অচল।

সাধু ও চলিতের মৌল পার্থক্য

যাইহোক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এককালে সমস্ত এলাকা জুড়ে একছত্র আধিপত্য ছিল সাধুভাষার। ক্রমশ চলিত ভাষাকে অধিকার ছাড়তে ছাড়তে আজ সে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। যেটুকুতে তার অধিকার আজো আছে সেখানে সে চলিত ভাষার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আপোষ করে নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত উপমা উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করি—

"—রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই রাণী, দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী; একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু

ভাষা, আর একটাকে কথ্য ভাষা ; কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত-বাংলা। সাধুভাষা মাজা ঘসা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধারকরা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।···রূপকথায় শুনেছি দুয়োরাণী ঠাঁই দেয় সুয়োরাণীকে গোয়ালঘরে ; কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। বাংলা চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁসেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবোর নিকানো আঙিনার পাশে, যেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোর বেলাতে।

গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসেনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে—"

কবির এই ভবিষ্যদ্বানী কতদিনে সফল হবে জানিনে তবে বর্তমানের সহাবস্থান নীতি অনুযায়ী দুই রাণীই আজ রাজান্তঃপুরে সমান সম্মানজনক রাণীর স্থান পেয়েছেন।

অনুশীলনী

রচনায় সাধু ও চলিত এই দুটি ভাষা যাহাতে মিশিয়া না যায় ইহা ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য রচনা শিক্ষার্থীকে সাধু ও চলিত বাংলায় রূপগড পার্থক্য কিরূপে নির্দেশ দিবে— কঃ বিঃ (বিটি ১৯৫৪)

গল্পবলা ও কবিতা পাঠ

শিশু যখন এই পৃথিবীতে প্রথম ভূমিষ্ঠ হল তখন সে কোন দেশের ভাষাকেই সঙ্গে করে আনেনি, জননী এবং জন্মভূমির ভাষা শুনতে শুনতে সে ক্রমশ সেই ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছে অজ্ঞাতসারে। এবং এই আয়ত্তিকরণের মধ্যেই তার আত্ম-বিকাশের কাজ সুরু হয়েছে।

কিন্তু এই আয়ত্তিকরণ কি ভাবে সুরু হয়? শিশু লক্ষ্য করে যে তাকে কেন্দ্র করে কত বিচিত্র কলকল ধ্বনি জলতরঙ্গের মত দিনরাত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শিশুমন সেই জলতরঙ্গে সব সময়েই ডুবে থাকে—নিজেও যোগ দেবার চেষ্টা করে। শিশুর মানসপটে কল্পনার শত রামধনুর ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—বিমুগ্ধ নয়নে সে শোনে ছেলে ভুলানো ছড়া প্রশ্ন করে—গল্প বল। শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে—গল্পের মধ্যে দিয়েই চলে তার কথাবার্তা, চলে তার ভাষা শিক্ষা। দেহ আর মন এই দুই নিয়েই মানুষ। দেহের পুষ্টির জন্য তার ফুসফুস দুটো যেমন অনবরত বাতাস টেনে নিচ্ছে পাকস্থলী নিচ্ছে খাদ্য আর জল, তেমনি মন বিচিত্র কল্পনার ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করছে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। —এই কল্পনার খাদ্য যোগায় গল্প।—তাই খাদ্য গ্রহণের মতই গল্প শোনার আগ্রহ শিশুদের সহজাত।

সুতরাং শিশুপাঠের প্রথম অধ্যায়টি হল গল্প বলা। তাই পৃথিবীর সকলদেশেই অপরূপ শিশুগল্পের উদ্ভব ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ শিশুদের মন; সত্য-মিথ্যার বাস্তব তার দিয়ে তৈরী যুক্তির কঠিন জালাবরণে শিশুর চক্ষুদুটি তখনও আবদ্ধ হয়ে যায়নি। সমস্ত মনটি তার অসংখ্য চক্ষু দিয়ে গড়া, বাস্তবে যেটা নাই কল্পনায় সেটা পুরণ করে নিতে তার একটুও বাধে না—সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে বেড়া তখনও উঁচু হয়ে ওঠেনি, অনায়াসেই মনটা এপাশ থেকে ওপাশে ঘোরা ফেরা করতে পারে। তাই এই বয়সের ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয় গল্প হল রূপকথা—পরীর গল্প। মাদাম মন্তেস্বরি অবশ্য অসত্য কথনের অজুহাতে এই ধরণের রূপকথা বা পরীর গল্প ছেলেদের বলতে নিষেধ করেছেন। এর ফলে ছেলেমেয়েদের নাকি বাস্তববিমুখ কল্পনাবিলাসী ভীরু অমানুষ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে।

কথাটা বোধহয় পুরোপুরি সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "—বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অত্যন্ত ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে—একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিষকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুকরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য···আমাদের মত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মের দাসত্বে

কল্পনাপ্রবণ শিশু চিত্তে গল্পের প্রভাব

অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্র তীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্ত্যলোক দেবতার জগৎলীলার অনুসরণ করে—" কাজেই শিশুদের প্রথমস্তরের সবচেয়ে প্রিয় গল্প হল—রূপকথা পরীর গল্প···।

তারপর শিশুদের নানারকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তের বিচিত্র চিন্তার আল্পনা গল্পাকারে বললে শিশুরা আগ্রহান্বিত হয়ে শোনে। এছাড়া নানারকম জীবজন্তু গাছপালার মুখে কত রকম গল্প তৈরী করেছেন ঈসপ বিষ্ণুশর্মা প্রভৃতি পূর্বকালের খ্যাতনামা শিশুশিক্ষকগণ।

ক্রমশ শিশু বড় হয়, তার কল্পনা রাজ্যের মাঝখানে বিরাজ করে শিশু স্বয়ং। সেই তখন তার মনোরাজ্যের সম্ভব অসম্ভব ঘটনাপুঞ্জের নায়ক। কখন সে বীরপুরুষ হয়ে মাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে, কখনও ফেরিওয়ালা, কখনও ঘাটের মাঝি, কখনও বা হাটুরে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, আবার কখনও বা বিড়ালছানাটির কানাই মাষ্টার। নানারকম অভিযান-মূলক কাহিনী সে উপভোগ করে। শতরকম বিপদপাতের মধ্য দিয়ে বীরদর্পে শিশুমন এগিয়ে চলে·····

এইভাবে গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুর ভাষাজ্ঞান বাড়তে থাকে। শিশুর বয়স মানসিক সামর্থ্য ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। তারপর তা অত্যন্ত সহজ সুন্দর সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে নানা

প্রকারের ভাবপ্রকাশক ভঙ্গীতে কণ্ঠ ধ্বনির যথোপযুক্ত বৈচিত্র্য সম্পাদন করে বক্তব্য বিষয়টিকে শিশুমনে স্পষ্ট করে তুলবেন।

—বলা বাহুল্য গল্প বলার কৌশলের উপরই গল্পে মাধুর্য অনেকখানি নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে, গল্পপড়া অপেক্ষা গল্প বলার প্রভাব অনেক বেশী। গল্পের বই যত চিত্তাকর্ষকই হোক শুধু পঠনের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন। কিন্তু সেই গল্পটিই যদি শিক্ষক নিজের মন থেকে বলার ভঙ্গীতে মুখে মুখে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে বলে যেতে পারেন তবে তার ফল হয় অনেক বেশী। মনে হবে গল্পটা যেন শিক্ষকের নিজেরই তৈরী এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে তা তৈরী হয়ে চলেছে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তাঁর ব্যক্তিগত বাচন-কৌশল সমস্ত মিলে গল্পটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে ক্লাশে। এইভাবে শিক্ষক যত সহজে সমস্ত শ্রেণীকক্ষে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, এমন আর কিছুতে নয়।

গল্প বলার কৌশল

...কোন কিছু পড়াতে গেলে পূর্ব হতেই তার জন্যে যেমন প্রস্তুত হয়ে যেতে হয় গল্প বলার জন্যও তেমনি নিজেকে ভাল করে প্রস্তুত করা দরকার। যে শ্রেণীতে গল্প বলার পাঠ দিতে হবে গল্পের ভাব ভাষা ভঙ্গী বা শব্দ সব কিছু যেন সেই শ্রেণীর উপযুক্ত হয়। নানা প্রকার ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কিছু কিছু পরিবর্তন করলে গল্পটি সজীব হয়। মনে রাখতে হবে গল্প বলা আর বক্তৃতা করা এক জিনিস নয়। সহজ

মোলায়েম আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে শিক্ষক যখন গল্প বলবেন তখন ছাত্র ও শিক্ষক মিলে যেন একটা একাত্মতার ভাব সৃষ্টি হয় শ্রেণীকক্ষে, তবেই গল্প বলার পাঠ সার্থক হবে।

শিক্ষকের এইগুণগুলি কেবল যে গল্প বলার বেলাতেই কাজে লাগে তাই নয়, সাহিত্য পঠন পাঠনাতেও শিক্ষকের এই গুণ-গুলি অপরিহার্য।

কাব্য সাহিত্য পড়াতে হলেও কেবল মাত্র ভাষাজ্ঞান থাকলেই চলবে না সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের রসবোধও থাকাচাই।

গল্প বলতে গেলে শিক্ষকের যেমন স্পষ্ট উচ্চারণ, ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন প্রয়োজন, গদ্যপদ্যপাঠের ক্ষেত্রেও সেটি প্রয়োজন।

কাহিনীর ভাবে সম্পূর্ণ রূপে ভাবিত না হতে পারলে গল্প বলে জমান যায় না, গদ্য পদ্য পঠন পাঠনাতে শিক্ষকে তেমনি পাঠ্য-বিষয়ের ভাবে ভাবিত হতে হয় নইলে পড়ানো জমেনা। গল্প বলার ক্ষেত্রে যে সব কৌশল এবং অধিক ব্যবহার করা হয়, যে আন্তরিকপূর্ণ ভাবাবেগ উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে সহজ ও স্বাভাবিক আন্তরিকতার উদ্ভব ঘটে সাহিত্য পাঠের সকল দিকেই তার একান্ত প্রয়োজন। ভাল গল্প বলে সকল ছাত্রের মনোযোগ দীর্ঘকাল ধরে আকর্ষণ করে রাখবার দুর্লভ ক্ষমতা যে শিক্ষক রাখেন সাহিত্য পাঠেও তিনিই সার্থক শিক্ষক।

গল্প বলা ও সাহিত্য পাঠ

শিশুশিক্ষার প্রথম পর্যায়টি হল এইভাবে কানে শুনে শেখার কাল। প্রথমে শিশু শুনবে শিক্ষক বলবেন, তারপর, শিশু বলবে শিক্ষক শুনবেন। শিশুর চিন্তাধারা মুখের কথায় প্রকাশ করতে শেখার মূল্য অপরিসীম। বড় হলে শিক্ষনীয় বিষয়টির পরিচয় আমরা গ্রহণ করি লেখনের মাধ্যমে, অর্থাৎ বড় ছেলেরা লিখে পরীক্ষা দেয়—কিন্তু শিশুশ্রেণীতে মুখে মুখে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় শুধু যে বিষয় বস্তুর অর্জিত জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয় তা নয়, মনের কথা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে বলবার ক্ষমতারও পরীক্ষা হয়। জীবনের যাত্রা পথে ভাবের আদান প্রদান সব সময়েই আমাদের মুখের ভাষায় দিতে হয়; কথাবার্তার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে হয় সে সময়ে লিখে বুঝাবার সময়ও নেই, সুযোগও নেই। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মৌখিক পরীক্ষার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে যেটা বড়দের পরীক্ষাতেও অনুশীলন যোগ্য।

মৌখিক পাঠদানের প্রসঙ্গে এইবার কবিতা আবৃত্তির কথা বলতে হয়। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার অভ্যাস অনুশীলন করতে হলে যত রকম কৌশল করতে হয় তার মধ্যে আবৃত্তির স্থান সর্বোচ্চে।

শিশুকালের ছড়া আবৃত্তি থেকে সুরু করে বড় বয়সের ভাবপ্রধান রসব্যঞ্জনাময় কবিতা আবৃত্তি সবই একই শক্তির ক্রমবিকাশ। শিশুবয়সের কবিতায় ভাবগভীরতা অপেক্ষা কল্পনার লীলা মাধুর্য, ধ্বনিব্যঞ্জনা অপেক্ষা ছন্দের নৃত্যচাপল্যের

প্রাধান্য বেশী। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বয়স উপযোগী কবিতা সঙ্কলন করতে হয়। কবিতার উপভোগ আনন্দে, কাব্যরসাস্বাদ ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদের সহোদর বলে কাব্যরসিকেরা অনুমান করেন। এই হিসাবে কাব্যপাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কাব্যরসামৃত পানে পরমানন্দ উপভোগ করা। এই প্রসঙ্গে ভাষাজ্ঞান ব্যাকরণজ্ঞান প্রাসঙ্গিক ভাবে যদি কিছু আসে আসুক কিন্তু জ্ঞানচর্চা যেন কখনই বড় হয়ে উঠে রসানুভূতিকে নিষ্প্রভ করে না দেয়। কবির অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ অনির্বচনীয় অনুভূতির আনন্দ ও অপূর্ব রূপ নির্মিতির কৌশল ধ্বনিসুষমা ও ছন্দব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ফূর্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতানুসারে রসই হল কাব্যের আত্মা এবং সেই রসাস্বাদের আনন্দই হল কাব্যপাঠের আনন্দ। কাব্যপাঠের কালে কাব্যস্থিত রসাত্মক বাক্য সহৃদয় হৃদয়সংবাদী পাঠকের চিত্তে অনির্বচনীয় রসাবেশ ঘটায়, কবি চিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাহিত্য অর্থাৎ সংযোগ সাধিত হয়।

শিশু চিত্তে কবিতার প্রভাব

সুতরাং কাব্যপাঠদানকালে কাব্যপাঠের এই উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পঠনের সার্থকতা বিচার করতে হবে। কবির আনন্দের রসধারা যদি সহৃদয় পাঠকের তদ্গতচিত্তে প্রবাহিত করে দিতে হয় তাহলে কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই সেই রসের সঞ্চরণ ঘটাতে হয়। অতএব কাব্যপাঠ হবে প্রধানতঃ রসসঞ্চরী পাঠ। কাব্যের প্রত্যেকটি শব্দের

একএকটি বিশেষ অর্থ আছে এবং সেই অর্থের বন্ধন দিয়ে ঘেরা শব্দসমষ্টি মানবমনে একটি নির্দিষ্ট ভাবচিত্র অঙ্কন করে কিন্তু শব্দ সজ্জার কৌশলে শব্দার্থকে ছাড়িয়ে ধ্বনিব্যঞ্জনা এমন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতির-লোকে নিয়ে যায় সেটা কিছুতেই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়, অনুভূতিগ্রাহ্য। রসসঞ্চারী পাঠের দ্বারা কবি চিত্তের সেই অনুভূতিময় আবেগ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয় এবং ক্রমশ পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত রসাপ্লুত ও অভিভূত করে ফেলে। এইখানেই কাব্যপাঠের সার্থকতা।

কাব্য পাঠের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

কাব্যপাঠের আরো একটা উপযোগিতা আছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দবেগে স্পন্দমান। ছন্দ হিল্লোলের আন্দোলনে মানুষ যে আনন্দ লাভ করে সে হল একেবারে প্রাথমিক জৈব-আনন্দ। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে সুরু করে অনু-পরমানুর ঘূর্ণন নিয়ত ছন্দাবেগে আবর্তিত, মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস শোণিত প্রবাহ চলেছে ছন্দে ছন্দে, তাই ছন্দের দোলা মানুষের অন্তরে যে আনন্দের ঢেউ তোলে সে হল একেবারে প্রাথমিক জৈব আনন্দ। পরিমিত পদবিন্যাসের ফলে কবিতার বাণীপ্রবাহে যে নৃত্যচপলতা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে কবিতার সরস পাঠের দ্বারাই সেই আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারি। কবিতার অর্থময় ভাবপ্রবাহের সঙ্গে ছন্দময় রূপপ্রবাহের যুগলমিলন মানবের চিতে অভিনব সঙ্গীতপ্রবাহের সৃষ্টি করে। তাই কাব্যপাঠের আর এক উদ্দেশ্য কাব্যের এই সঙ্গীত-ধর্মীতা

উপভোগ। সুতরাং কবিতা পঠনের কালে কবিতার সরব পাঠ অপরিহার্য। উপযুক্ত ভূমিকা বা আয়োজন আলোচনা পূর্বক কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করবার পরই দ্বিতীয় সোপানের প্রারম্ভে স্বর, যতি, ছন্দ, অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র কবিতাটির রসসঞ্চারী আদর্শ পাঠ দান করবার প্রয়োজন। কারণ এই জাতীয় আদর্শ পাঠের মাধ্যমেই কবি ও কাব্যরসিকের মনে সাধারণীকৃতি সৃষ্টি হবে। এই হল কাব্যপাঠের ও কাব্য আবৃত্তির সার্থকতা। কিন্তু কাব্য পাঠের সার্থকতা থেকেও কাব্য আবৃত্তির সার্থকতা অধিক। বই খুলে আমরা যখন কাব্য পাঠ করি তখন আমাদের সমগ্র মননশক্তি কাব্যরসাস্বাদে নিযুক্ত থাকতে পারে না, পঠনক্রিয়ার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খানিকটা মনোযোগ রাখতে হয়, অথচ মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করতে হলে সমগ্র মননক্রিয়াই কাব্যরসাস্বাদে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে।

তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে—জীবনের যাত্রাপথে কত বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতা দিনরাত আমাদের মনকে অনুরঞ্জিত করে চলেছে, স্থূল জৈব প্রতিক্রিয়ায় তা প্রতিফলিত হচ্ছে সবসময়ে। এই সব অভিজ্ঞতা কবি চিত্তকেও অনুরঞ্জিত করে অথচ তার প্রতিক্রিয়ায় বেজে ওঠে অপরূপ সঙ্গীতঝঙ্কার। সেইসব সঙ্গীতঝঙ্কার যদি মুখস্থ থাকে তাহলে অনুরূপ অভিজ্ঞতায় আমাদের জড়চিত্ত কবি চিত্তের সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্বর্গীয়সুরে অনুরণিত হতে পারে।

তাই ভাল কবিতা যতবেশী মুখস্থ রাখা যায় ততই ভাল। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে ভাল কবিতা বাছাই করতে হবে এবং সেই সব বাছাই কবিতা সাধ্যমত মুখস্থ করতে সাহায্য করতে হবে।

এইবার মুখস্থ করার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করি—মুখস্থ করার বিজ্ঞানসম্মত সুপদ্ধতি অনুসরণ না করায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুখস্থকরা কাজটা অত্যন্ত ভীতিজনক ও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণতঃ সম্পূর্ণ কবিতাটিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দু'এক ছত্র করে টুকরো টুকরো ভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করে ছেলেরা। ফলে সেই চেষ্টা হয় ক্লান্তিকর এবং ব্যর্থ। তার পরিবর্তে ভাব অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সমগ্র কবিতাটি ধীরে ধীরে বার বার পড়লে কবিতাটি সহজে আয়ত্ত হয়। আনন্দের সঙ্গে কোন কাজ করলে তবেই তা সহজ হয় এবং তার ফল হয় দীর্ঘ স্থায়ী। আবৃত্তির সঙ্গে যদি অভিনয় ভঙ্গীর সাহায্য নেওয়া হয় তবে মুখস্থের কাজ আরও সহজ হয়, সুন্দর হয় এবং সার্থক হয়।

অনুশীলনী

১। শিশুসাহিত্যে কবিতার স্থান কতখানি? প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালকবালিকাদের কি ধরণের কবিতা পড়াইতে তাহার নমুনা দাও— (কঃ বি বিটি ১৯৪৭)

২। বাংলাভাষার সহিত শিশুর প্রথম পরিচয় কি ভাবে করাইতে হইবে তাহা বিশদভাবে লিখ— (কঃ বিঃ ১৯৪৮)

৩। কবিতা পড়াইবার সময় নিছক পাঠের উপর জোর দেওয়ার বিশেষ কোন আবশ্যকতা আছে কিনা তাহা আলোচনা কর।

(কঃ বিঃ ১৯৫১)

৪। গল্প বলিতে জানিলে শিক্ষকের বাংলা ও সাহিত্য পড়াইবার পক্ষে কি সুবিধা হয়, তাহা বিষদভাবে আলোচনা করুন।

কঃ বিঃ (বিটি ২৯৫৮)

———

পঠন শিক্ষা

ইতিপূর্বে শুনে শেখার কথা বলা হয়েছে। তার পরের স্তর হচ্ছে পড়ে শেখার কাল। পড়া হল দুইজাতের—সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। প্রথমে সরব পাঠের আলোচনা করে শিশুর অক্ষর পরিচয় হবার পর ক্রমশ সে শব্দ ও বাক্য পড়তে শেখে। এই পড়াটা প্রধানতঃ পঠনের কৌশল আয়ত্ব করবার জন্যই, তার পরে হবে ভাষা শিক্ষার পাঠ এবং সব শেষে সাহিত্য শিক্ষার পাঠ।

প্রাথমিক স্তরের পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হবে অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের শুদ্ধ সুষ্ঠু উচ্চারণ। এইভাবে শিশুর শব্দভাণ্ডার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শব্দগুলির সত্যকার উচ্চারণ শিক্ষাও হতে থাকে।

সরব পঠনের প্রয়োজনীয়তা

পাঠের সময় কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। অতি উচ্চস্বরে বা অতি নিম্নস্বরে পাঠ করলে সে পাঠ শ্রুতি-মধুরও হয়না, ভাব প্রকাশোপযোগী ব্যঞ্জনাও পরিস্ফুট হয় না। বিচিত্র স্বরভঙ্গীর দ্বারা বক্তব্য বিষয়টিকে জনসাধারণের মনে মুদ্রিত করে দিতে হয়। সুতরাং লেখকের মনের বিচিত্র ভাব শ্রোতার মনে ফুটিয়ে তুলতে হলে তা কণ্ঠস্বরের হ্রাসবৃদ্ধির সাহায্য নিলে তবেই ভাল করে করা যায়। সরব পাঠের আর

একটা বড় কথা হল বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ। প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্তভাবে স্বরযন্ত্রের সাহায্যে স্বর উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গীটির দিকে শিশুকে অবহিত করতে হয়। শিশুকালে শিশুর বাগযন্ত্র থাকে নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম। সুতরাং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষার এই হল সময়। এই সময়ে কোন অক্ষরের বা শব্দের ভুল উচ্চারণ অভ্যস্থ হয়ে গেলে বড় হলে তা আর সংশোধন করা সহজ নয়।

বড়দের কথায় অনেক সময়েই উচ্চারণের অনেক ভুল দেখতে পাওয়া যায়। শ স ষ কে অনেকে স বা ছ (s) দিয়ে উচ্চারণ করে, 'সাম বাজারের সসীবাবু' জাতীয় ছ ধরণের স উচ্চারণের একটা মুদ্রাদোষ অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়। র ও ড় এর উল্টা পাল্টা ব্যবহার ও উচ্চারণ ত আজকাল অতি সাধারণ ভুলের পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে। 'ঘড়বারি জাতীয় ভুল আজকালকার লেখায় বা বলায় ত হামেশাই দেখা যাচ্ছে। আবৃত্তি শুনতে গিয়ে "মনে কড় যেন বিদেশ ঘুড়ে" ধরণের কথা কত শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

ল ও নয়ের উচ্চারণ বিপর্যয় ত বাংলার একটা আঞ্চলিক মুদ্রাদোষ। নাউ, নঙ্কা, নেবু অথবা লৌকো, লদী প্রভৃতি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কোন কোন অঞ্চলে খুব বেশী শোনা যায়। তেমনি স, শ, ষ কে হ উচ্চারণ। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে শতায়ু হবার আশীর্বাদ নাকি হতায়ু হবার অভিশাপে পরিণত হবার আশঙ্কা

আছে বলে অনেকে রহস্য করেন। কোনও অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্যে হাস্য হয় হাঁসি কোথাও বা তার বিলুপ্তির ফলে হয় চাদ বাশ হাস। এই ধরণের ভুল উচ্চারণ সংশোধন করতে হলে শিশুকাল থেকেই প্রত্যেকটি বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ অনুশীলন করতে হয়।

মাতৃভাষার উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। যে ভুখণ্ড জুড়ে বাংলাভাষা ব্যবহৃত, তার উচ্চারণভঙ্গী সর্বত্র এক নেই। চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের ভাষা দেখলেই বোঝা যাবে একই বাংলাভাষা আঞ্চলিক প্রভাবে সরতে সরতে কত তফাৎ হয়ে যেতে পারে। ভাষাবিদেরা সমগ্র বাংলাভাষা ভাষী এলেকাকে মুখের উচ্চারণের দিক থেকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন—আগেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই সব আঞ্চলিক উচ্চারণপদ্ধতির বিশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজন এখানে নাই তবে এইটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়, এত বিভিন্নতার মধ্য থেকেও সারাবাংলায় একটা আদর্শ চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে এবং সেই চলিত ভাষা কেমন করে সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা লাভ করছে পূর্ব প্রবন্ধে সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক শিশুর উচ্চারণভঙ্গীর উপর পারিবারিক প্রভাব যে যথেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সত্বেও শিশুশিক্ষার সময়ে বর্ণের অক্ষরের ও শব্দের আদর্শ উচ্চারণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

ভাষাশিক্ষার গোড়াতে শিশু আধ আধ কথা বলে, সেটা তার বাকযন্ত্রের অপুষ্টতার জন্য। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাকযন্ত্রের অপুষ্টতা কেটে যায়, উচ্চারণ স্পষ্টতর হয়। বড় হলেও যাদের তা হয় না, বুঝতে হবে হয় তাদের বাকযন্ত্রের দোষ, নয়ত শিক্ষার দোষ। বাকযন্ত্রের দোষ থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল।

আমাদের দায়িত্ব শিক্ষার দোষ সম্বন্ধেই সমধিক। শিশুদের কতকগুলি বদ অভ্যাসের ফলেও উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে—যেমন তোৎলামি, ঘন ঘন নিশ্বাস টানা, সুর টেনে কথা বলা ইত্যাদি। তাড়া দিয়ে, বকে অথবা জোর করে এগুলি ছাড়ান যায় না, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা, যত্ন ও স্নেহ দ্বারা ধীরে ধীরে এগুলি দূর করতে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা এবং প্রথম কথা হল, যে শিক্ষক বাংলা পড়াবেন বাংলা শব্দের আদর্শ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণ ভঙ্গীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলারও আছে। সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষককেই প্রথমে অবহিত হতে হবে, তাহলেই তিনি ছাত্রদের ঠিকমত শেখাতে পারবেন। বাংলার বর্ণমালা সংস্কৃতের অনুরূপ বটে কিন্তু তার উচ্চারণ সংস্কৃতানুগ নয়, বাঙালীর জিহ্বার স্বরের হ্রস্বতা দীর্ঘতা নেই, তার পরিবর্তে আছে স্বরাঘাতের তীব্রতা ও ক্ষীণতা। বাংলায় সাধারণতঃ শব্দের প্রথমেই

ধ্বনি বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা

শ্বাসাঘাত পড়ে। পদান্তের স্বরধ্বনি সাধারণতঃ লুপ্ত হয়ে যায়, এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সুস্পষ্ট উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে পঠন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এবং ভুল হলে যথাসাধ্য সংশোধন করতে হবে। সংশোধনের পদ্ধতি আছে বহু কিন্তু তার আসল কথাটি হচ্ছে সস্নেহ সহানুভূতিশীল ব্যবহার। ছেলের বিকৃত উচ্চারণ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে কখনও হাসি রসিকতা করা উচিত নয়। সরব পাঠের সময় যে উচ্চারণ-বিকৃতি ধরা পড়ে বার বার পাঠের দ্বারাই তা সংশোধন করা যায়।

শ্রেণীকক্ষে অনেক সময় সমস্বরে পাঠ করতে দেওয়া হয়। এর একটা সুবিধা আছে—শুদ্ধ উচ্চারণকারী কোন ছেলে বা শিক্ষকের আদর্শপাঠ অনুকরণ করে সবাই যদি সমস্বরে পাঠ করে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের পাঠ সংশোধন হতে পারে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেপুলেরা সমস্বরে চিৎকার করে পড়তে খুবই আনন্দ পায়।

সমবেত পাঠ

তবে সমস্বরে পাঠের একটা অসুবিধাও আছে। অনেক দুষ্টু ছেলে গণ্ডায় আণ্ডা দিয়ে পড়ায় ফাঁকি দিতে পারে—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবার দরকার। তাছাড়া অন্য শ্রেণীকক্ষের পাঠে অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

পঠনশিক্ষার গোড়ার দিকে অর্থাৎ শিশু শ্রেণীর শিশুদের

সমস্বরে পাঠ করতে দেওয়া ভাল। তারপর শিশুদের উচ্চারণ কৌশল ক্রমশ আয়ত্তে এলে সমস্বরে পাঠের পরিবর্তে একক সরব পাঠ করতে দিতে হয়।

আরো উঁচু শ্রেণীতে উঠলে সরব পাঠ কমিয়ে দিয়ে নীরব পাঠ করতে শেখাতে হবে। বড়দের মধ্যেও অনেকের চেঁচিয়ে পড়ার অভ্যাস আছে চেঁচিয়ে না পড়লে তাদের মনঃসংযোগ হয় না। বলাই বাহুল্য এটা বদ-অভ্যাস। বাল্যকালে নীরব পাঠের চর্চা না করার ফলেই এইরূপ ঘটে থাকে।

নীরব পাঠ

সমস্ত শব্দ বা সম্পূর্ণ বাক্যের প্রতিরূপটি মনশ্চক্ষে একসঙ্গে দেখতে পারলে তবেই নীরব পাঠ করা সম্ভব। ছোট ছোট বাক্য থেকে সুরু করে ক্রমশ বড় বড় লেখা নীরব পাঠের বিষয় বস্তু করতে হয় এবং সরব পাঠের অভ্যাসকে ধীরে ধীরে নীরব পাঠের অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। নীরব পাঠের দ্বারাই রচনার রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায়; সমগ্র মনকে রচনার দিকে নিবিষ্ট না রেখেও রচনার বিষয়বস্তুর সম্মন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং সব চেয়ে বড় কথা পঠনের দ্রুততা অর্জন করা যায়। বহুপাঠরত বড়দের কাছে পঠনের এই গুণটির মূল্য যে কত বেশী তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এছাড়া পাঠের বিষয় বস্তুর বিভিন্নতার দিক থেকেও পাঠন ক্রিয়াকে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। আমরা কবিতা পাঠ করি, জটিল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পাঠ করি এবং দৈনিক সংবাদ পত্রের

প্রবন্ধও পাঠ করি। বলাই বাহুল্য এই তিন জাতীয় পাঠের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন, সুতরাং পদ্ধতিও বিভিন্ন।

প্রথমে কবিতা বা রস-সাহিত্য পাঠের আলোচনা করি। এই প্রকার পাঠের বিষয়বস্তু বা ঘটনা পুঞ্জ প্রধান কথা নয়। এর প্রধান কথা হল রসোপলব্ধি। অবশ্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বণ করেই রসনির্মিতি ঘটে কিন্তু বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় ব্যাঙ্গার্থ, সৃষ্টি হয় ধ্বনিরূপ, অন্তরের মধ্যে ঘটে অনির্বচনীয় রসানুভূতি। এই জাতীয় পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হল কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ মাত্র তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে স্বাদনা পাঠ (appreciation study)। স্বাদনা পাঠে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নাই, থাকলেও তা এতই সামান্য যে তার ফলে রসোপলব্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। শ্রেণীকক্ষে সাহিত্য পাঠের সময়ে, বিশেষতঃ কবিতা পাঠের সময়ে যে রসসঞ্চারি পাঠ দেওয়া হয় তাই হল স্বাদনা পাঠ। রস আস্বাদই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। বিচার বিশ্লেষণ, বা ব্যাকরণের বিচিত্র প্রয়োগ কৌশলের কথা একেবারেই "এদো বাহু"। বলাই বাহুল্য এই প্রকার স্বদনা পাঠ বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে কাব্য সাহিত্যাদি পাঠের বেলাতেই প্রয়োগ করা যায়।

স্বাদনা পাঠ

কিন্তু সর্বপ্রকার রচনাই ত রস সাহিত্য নয়, রসাস্বাদই সব পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। যুক্তি বিচারের দ্বারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে বুঝে নিতে হয় অনেক রচনায়। এই প্রকার পাঠের নাম

দেওয়া যায় চর্বনা (critical study) পাঠ। মুখের মধ্যে কোন কঠিন খাদ্য নিয়ে রীতিমত চর্বনের দ্বারা যেমন তাকে নিষ্পেষিত করে ফেলি, এই জাতীয় পাঠ্যকেও আমরা তেমনি বুদ্ধি বিচার দিয়ে ভেঙ্গে চুরে বিশ্লেষণ করে ফেলি। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও তার প্রয়োগ কৌশলের তাৎপর্য অনুধাবন করে মর্ম গ্রহণ করবার চেষ্টা করি। সাহিত্যের রচনা যেখানে বিষয় বস্তুরই প্রাধান্য সেখানে চলবে এই চর্বনা পাঠ।

চর্বনা পাঠ

এছাড়া আরো এক প্রকার পাঠ আছে যাতে স্বাদনা চর্বনা এই দুয়েরই প্রভাব অল্পবিস্তর রয়েছে। এই পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল মাত্র স্বাদ গ্রহণ নয়। আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব গ্রহণও নয়, বক্তব্য বিষয়ের একটা সামগ্রীক তথ্য গ্রহণ মাত্র। খবরের কাগজ পাঠের দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগেই।

এই পাঠে আমরা রস গ্রহণ বা তত্ত্বগ্রহণ কোনটাই করি না, করি কেবল মাত্র বক্তব্য বিষয়ের মর্মগ্রহণ। এই প্রকার পাঠের নাম আমরা দিতে পারি ধারণা পাঠ (comprehensive study) কারণ বক্তব্য বিষয়টির স্থূল ধারণাই এখানে এক মাত্র লক্ষ্য। কেউ কেউ এটিকে আয়ত্তিকরণ পাঠ নামেও অভিহিত করেন। বিদ্যালয়ে দ্রুত পঠনের জন্য যে পাঠ দেওয়া হয় সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত পঠনের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ধারণা গঠন বা আয়ত্তিকরণ, তাই এটিকে আমরা ধরণা পাঠের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

ধারণা পাঠ

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে ভাষা ভাল করিয়া শিখাইতে গেলে ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) সঙ্গে সামান্য পরিচয় দরকার হয় কি? হইলে কেন হয় তাই লিখ। [ক বি বি টি ১৯৫৬]

২। নীরব পাঠ ও সরব পাঠ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া ৭ম শ্রেণীতে বাংলা পড়াইবার সময় উহাদের কিভাবে প্রয়োগ করিবে তাহা বিবৃত কর। [ক. বি. বি টি ১৯৫৬]

৩। "পাঠ ত্রিবিধ। চর্বণা (Critical appreciation) স্বাদনা (appreciation) আয়ত্তীকরণ (Comprehersion)।"

এই তিন জাতীয় পাঠকে কিভাবে পৃথক করিবেন তাহা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করিয়া দিন। [ক. বি. বি টি. ১৯৫৯]

লিখন শিক্ষা

ভাষার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। অথচ শুধু এই ভাবে ভাব প্রকাশের কার্যটি কেবল মাত্র বর্তমান কাল ও সমুপস্থিত পাত্রকে উপলক্ষ্য করেই ঘটতে পারে। অনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ভাবীকালের উদ্দেশ্যে কোন ভাব নিবেদন করতে হলে শুধুমাত্র মৌখিক ভাষায় তা করা সম্ভব নয় একথা ত বলাই বাহুল্য না। কিন্তু অসম্ভব বলে থেমে থাকবার পাত্র ত মানুষ নয়···তাই সে তার মৌখিক শব্দগুলিকে কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে স্থায়ীরূপ দেবার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে কতরকম ভাবে যে এই চেষ্টা চলেছে তার আর ঠিক নেই। সামাজিক জীব মানুষ—পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান ত তাকে সব সময়েই করতে হয়, তাছাড়া অতীত দিনের অভিজ্ঞতার সম্পদ সম্বল করেই ত মানুষ আগামী দিনের জয় যাত্রা সুরু করে কিন্তু সেই অতীতের ভাবসম্পদগুলি সে ধরে রাখবে কি করে? কি করে সে পৌঁছে দেবে সে সম্পদ উত্তর পুরুষের হাতে? সুতরাং মানুষ তার মুখের উচ্চারিত ক্ষণস্থায়ী শব্দ প্রবাহকে নানাপ্রকার রেখার বন্ধনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছে কখনো, পাথরে কখনো, কাঁচা মাটির গায়ে, কখনো গাছের পাতায়, কখনো কাগজে।

এই সব রেখাগুলিই হল উচ্চারিত ধ্বনির প্রতীক চিহ্ন··· মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনীর আলোচনা অবশ্য বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। যাই হোক এই ভাবে গড়ে উঠল লিপিতত্ত্ব···সৃষ্টি হল লিপিরূপ, উদ্ভব হল বর্ণ অক্ষর।

লিপিতত্ত্ব ও লিপিরূপ

সামাজিক মানুষের মুখের ভাষার যেমন একটা সর্বজনবোধ্য সামাজিক রূপ আছে তার প্রতীক চিহ্নেরও তেমনি সর্বজন-বোধ্য সুন্দর ও সরল রূপ থাকবার কথা। —মাতৃভাষা ত শিশু মায়ের মুখ থেকে এবং পরিবেশ থেকে অজ্ঞাতসারেই শিখে নিচ্ছে কিন্তু তার পিছনে মানুষের হাজার হাজার বছরের সাধনার ফল প্রতীক চিহ্নগুলির যে সব সমাজগ্রাহ্য রূপ আছে সেগুলির অনুশীলন-সাপেক্ষ—শিশু মাতৃভাষা বলতে শেখে অজ্ঞাত সারে এবং স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু লিখতে শেখে অত্যন্ত পরিশ্রম করে। তাই বর্তমানে শিশুশিক্ষার একটা বড় অংশই হল লিখন শিক্ষা। তাই লিখন-শিক্ষানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু লিখনশিক্ষানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলাচনা করবার পূর্বে লিখনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন! আমরা যখন আমাদের মনের ভাবানুরূপ ভাষার যথোপযুক্ত প্রতীকচিহ্নগুলি সাজিয়ে যাই অর্থাৎ যখন আমরা লিখি তখন অবশ্যই সেই চিহ্নগুলি অপরের মনে অনুরূপ ভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে এই আশা রাখি। বৃহৎ এই মানুষের

পৃথিবী, অসংখ্য মানবের মনে কত অসংখ্য ভাবসম্পদ ফুটে উঠেছে এবং উঠবে তার সব পরিচয় আমরা চাই, তাই নিয়েই আমরা এগিয়ে চলব। সভ্যতার অগ্রগতি চলবে অব্যাহত। দেশে দেশে কালে কালে মানুষ খণ্ডিত কিন্তু ভাবলোকে তারা এক এবং সেই ঐক্যলোকের বার্তা বহন করে লিপি-বিশ্ব মৈত্রীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাছাড়া মানুষের মনের অস্ফুট আবেগ ভাষার মধ্যে খানিকটা রূপ গ্রহণ করলেও লেখার মধ্যে যেমন সুস্পষ্ট সুসীমিত ও পারম্পর্য যুক্ত হয়ে ওঠে এখন আর কিছুতেই নয়। ইংরাজীতে বলে "writing makes a man perfect"—অর্থাৎ লেখার ফলেই মানুষের চিন্তাগুলি সুসম্পূর্ণতা লাভ করে। কারো কারো মতে হস্তলিপির মধ্যে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব নাকি অনেকখানি প্রকাশ পায় আলপোর্ট, ডাউনি প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদেরা ত মানসিক শক্তি বিচারে হস্তলিপির উপর অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। যাইহোক সুন্দর হস্তাক্ষর যে লেখকের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পবোধের পরিচয় দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লিখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব যে কত বেশী তা বলাই বাহুল্য।

প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে মানুষ লেখে এবং সেই লেখা অনুসারে পড়ে। অথচ লেখা অপেক্ষা পড়া সহজ। বর্ণের রূপ এবং তার উচ্চারণটি একান্তই মস্তিস্কের ব্যাপার এবং বুদ্ধিনির্ভর,

কিন্তু লিখনে চাই তার সঙ্গে পেশী নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্যবোধ।

আজ আমরা হয়ত সহজ সরল সচ্ছন্দ গতিতে অতিদ্রুত লিখে যাচ্ছি কিন্তু এই লিখন কার্যের পিছনে পৈশিক ও মানসিক ক্ষমতার সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগনৈপুন্য বড় সহজে আয়ত্বে আসেনি। একটি শিশুর লিখন প্রচেষ্টাকে পর্যবেক্ষণ করলেই তার শিক্ষার পথের বন্ধুরতা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হবে।

শিশু প্রত্যেক বর্ণটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে, শব্দের মধ্যে বর্ণপ্রবাহের নিরবিচ্ছিন্ন রূপ তার মনে কোন ছবি ফেলেনি।

শিশুদের লিখন বশিষ্ট্য

তাই বর্ণটির প্রত্যেক অংশের প্রতি তার অখণ্ড মনোযোগ, প্রত্যেক অংশটি সে সমান জোরে সমান চাপে লিখতে চায় তার ফলে শব্দের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। প্রত্যেক বর্ণে স্বতন্ত্রভাবে মনোমোথ দেবার ফলে লেখা হয় ছন্দহীন এবং অসমান।—লিখনের পেশিকে পরিচালনা করে চক্ষু এবং বুদ্ধি অথচ বড়দের বেলায় নিয়ন্ত্রণেই নিয়ন্ত্রিত হয় অক্ষরের ছাঁদ—মন ও বুদ্ধি বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ালেও কোন অসুবিধা হয় না।

বর্ণের সকল অংশে চাপ সমান লাগে না, আঙ্গুলের পেশির সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে সরু মোটা টানে গড়ে ওঠে একএকটি বর্ণ বা বর্ণ-গুচ্ছ। শিশুর লিখনকে এই স্বাভাবিক সুন্দর স্বয়ংক্রিয় পৈশিক কার্যে পরিণত করতে হলে শিশুমনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা দুই ভাগে

ভাগ করতে পারি—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীক। বাহ্যিক অংশে লিখনের উপকরণ ও পরিবেশ মার্জনা। কালি কলম কাগজাদি উপকরণ ও শ্রেণী কক্ষের আলোক ব্যবস্থা, টেবিল চেয়ারের উচ্চতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কালি যেন চুপসে না যায়, কলম যেন শিশুর আঙ্গুলের পক্ষে খুব সরু বা খুব মোটা না হয়ে যায়, কাগজ যেন বেশী চকচকে হয়ে আলোক প্রতিফলন না করে, টেবিল চেয়ারের উচ্চতা যেন ছাত্র ছাত্রী-দের উচ্চতা অনুসারে হয়,···এই সব বহিরঙ্গ দিকটা সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর অভ্যন্তরীণ অংশে মনের ক্রম-বিকাশের পরিচয় নিতে হবে।

লিখন শিক্ষার দুই দিক

আত্মবিকাশের সহজাত প্রবৃত্তি বশে শিশু দিনরাত আঁকি-ফাঁকি করে বেড়াতে চায়। হাতে কোন কাঠকয়লা বা ফুলখড়ি পেলে সারা বাড়ী নানারকম দাগ কেটে কেটে বেড়ায়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকেই লিখন শিক্ষার মৌলিক প্রেরণা হিসাবে কাজে লাগাতে হবে।

শ্রেণী কক্ষের দেয়ালে অনেকখানি করে সিমেণ্টের বোর্ড্ তৈরী করে রাখতে হয়, শিশুরা সেখানে ইচ্ছামত হিজিবিজি কাটে, ছবি আঁকে। এই ধরণের খেলায় আঙ্গুল দিয়ে লেখনযন্ত্র ধরার অভ্যাস হয় এবং সরু মোটা দাগ দেবার পেশি নিয়ন্ত্রণও কিছু কিছু শেখা হয়।

এরপর এই যথেচ্ছ দাগগুলিকে নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে

আনবার চেষ্টা করতে হয়। বোর্ডে বড় বড় করে গোল চৌকোণা, তেকোনা নকসা এঁকে শিশুকে রঙ্গীন চক দিয়ে তা ভরাট করতে দিতে হয়। ভরাট করায় অভ্যস্থ হয়ে গেলে শিশু নিজের থেকেই নানা আকারের নকসা আঁকতে পারবে। এরপর বর্ণমালা ভরাট করা এবং লেখা-বর্ণের উপর দাগা বুলান অভ্যাস করাতে হয়। এতদিনে শিশু পেশীশক্তির কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এইবার স্মৃতি থেকে বর্ণ যোজনা শেখাতে হবে। তার আগে বর্ণের আকৃতি সম্বন্ধে শিশুর মনে স্পষ্ট ছাপ পড়া চাই। শুধু মনের গায়ে ছাপ পড়লেই হবেনা আঙ্গুলের পেশীতেও তার ছাপ পড়া চাই।

কেমন করে লিখবে

তাই খসখসে শিরিষ কাগজে অক্ষর কেটে শিশুকে তারি উপর অক্ষর বুলাতে দিতে হয়, বালি বা তেতুল বিচি দিয়ে বর্ণ রচনা করতে দিতে হয়। এই ভাবে বর্ণ পরিচয় হয়ে গেলে শিশু তার চিত্র আঁকতে পারবে মন থেকে। এই কাজে দরকার হবে বর্ণমালার স্মৃতি চিত্র ও পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার সমন্বয়।

ক্রমশ আসবে বর্ণগুলির সুনির্দিষ্ট ছাঁদ ও তাদের আকারগত সমতা, তারপর বর্ণগুচ্ছের সামঞ্জস্য বিধান, যার ফলে বিবিধ বর্ণে গড়া শব্দের একটা সুসংবদ্ধ রূপ ফুটে উঠবে।

বর্ণ সাজিয়ে শব্দ এবং শব্দ সাজিয়ে বাক্য গড়ে ওঠে এবং বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির অন্তবর্তী ব্যবধানের সমতার লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই বাক্যগুলি যাতে কাগজের উর্দ্ধপ্রান্তের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে লিখিত হয় সেইজন্য লাইন টানা কাগজে লিখন অভ্যাস করতে হবে।

—এইবার প্রশ্ন—শিশু কি লিখবে?

—লেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পড়াও চলছে। শিশুর অজানা কঠিন ও অপরিচিত শব্দের লিখন অপেক্ষা পড়া বিষয় অবলম্বনে লেখন অভ্যাস করাই মনস্তত্ত্ব সম্মত। যে বাক্যের অর্থ শিশু জানে সেই বাক্য লিখতে শিশু সাধারণতঃ আনন্দ পাবে।

শিশুর নবজাগ্রত অমিত্ববোধকে উদ্বোধিত করবার জন্য তার নিজের নাম, নিজের সংগৃহীত চিত্রাবলীর পরিচয় লিপি, বিদ্যালয়ের বিবিধ অনুষ্ঠানের কার্যসূচী লিখতে দিলে শিশুর আত্মপ্রকাশের আনন্দ লেখার বিরক্তিকর কার্যকে আনন্দময় করে তোলে। শিশু ছবি আঁকবে, গল্প লিখবে, বন্ধু বান্ধবকে চিঠি লিখবে, এইভাবে খেলাচ্ছলে লেখাকে আনন্দময় করে তুলতে পারলে অনেকখানি পরিশ্রমের লঘুতা ঘটবে। সবশেষে লেখাকে সুন্দর করতে হবে। এরজন্য আদর্শ ভাল হাতের লেখা ছেলের সামনে রাখতে হয়। অজ্ঞাতসারে তা শিশুর সৌন্দর্য বোধকে জাগ্রত করে, লেখার ছাঁদকে সুন্দর করে তোলে। মোট কথা শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজাত প্রবৃত্তিকে, কর্মপ্রিয়তার প্রবৃত্তিকে, ও ক্রীড়া প্রবৃত্তিকে লেখনকার্যে অভিযোজিত করতে পারলে

কি লিখবে?

লিখনশিক্ষার বিরক্তিকর কাজ আনন্দময় হয়ে ওঠে, অল্প আয়াসেই শিশু ভাল লিখতে শেখে।

অনুশীলনী

১। কিভাবে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করা উচিত? লেখন কখন শিখাইবে? (কঃ বিঃ—বি টি ১৯৪৬)

২। হাতের লেখা কি করিয়া শেখান যায়? এ বিষয়ে শ্রুতি লিখনের স্থান কোথায়? (কঃ বিঃ—বি টি ১৯৫০)

৩। হাতের লেখা শিখাইবার উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া ইহা শেখান যায়? এ বিষয়ে শ্রুতিলিখনের স্থান কোথায়? (কঃ বিঃ—বি টি ১৯৫৫)

ব্যাকরণ শিক্ষা

মনের ভাবগুলি আমরা মুখের ভাষায় প্রকাশ করি এবং এক এক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রকাশ ভঙ্গীরও একটা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আছে। উচ্চারণভঙ্গী শব্দগঠন বাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতি সবদিক দিয়েই সে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়, নইলে ভাষার সর্বজনীনতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক ভাষারই পিছনে রয়েছে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মশৃঙ্খলা এবং এই নিয়মশৃঙ্খলাই হল ভাষার ব্যাকরণ। অস্থি কঙ্কালের সুকঠোর কাঠামোকে অবলম্বন করে যেমন সুন্দর লাবণ্যময় দেহের লীলা তেমনি রসাল সাহিত্যের অভ্যন্তরেও রয়েছে ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে"। মোট কথা ব্যাকরণ হল ভাষা শরীরের শারীরতত্ত্ব অর্থাৎ ভাষার বিজ্ঞান।

ব্যাকরণ কাকে বলে ?

আগেই বলেছি আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তখন তার ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব ও প্রয়োগতত্ত্বের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায়, যেখানে পাওয়া যায়না সেখানে ভাষা ব্যবহারে ভুল হয়েছে বুঝতে হবে সুতরাং সুষ্ঠু ভাষা-প্রয়োগ শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

ছেলেরা মাতৃভাষা শিক্ষা করে জননীর মুখ থেকে, জন্মভূমির পরিবেশ থেকে। প্রত্যেকটি ভাবের রূপ ভাষার মধ্যে সুন্দর ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে তারা শেখে ব্যাকরণ না শিখেও। আগে ভাষা, তারপরে তার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে কখন ভাষা তৈরী হয় না বরং ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সব সূত্র পাওয়া যায় তা' থেকেই ব্যাকরণ তৈরী হয়েছে। সুতরাং ছেলেরা যে ব্যাকরণ সূত্র জেনে তারপর ভাষা ব্যবহার শিখবে তা নয় অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখবার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা অপরিহার্য নয়।

ব্যাকরণ শিখব কেন ?

তবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে হলে তার ব্যাকরণের আইন মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ মাতৃভাষার আবেদন হৃদয়ের কাছে, আর বিদেশী ভাষার আবেদন বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে আয়ত্ত করতে হয় তার বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হয় সর্বাগ্রে। বাংলাভাষার ব্যাকরণও প্রথমে প্রয়োজন হয়েছিল বিদেশীদের শিক্ষার জন্যই। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী ফাদার ম্যানুএল-দ্য-আসুম্পসাঁও সর্বপ্রথম ফিরিঙ্গিভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তারপর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব ব্যাকরণ রচনা করলেন বাংলাভাষায়। রাজা রামমোহন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন ইংরেজী

ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ ?

ভাষায়, এবং সাতবৎসর পরে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য এই ব্যাকরণ অবাঙালীদের বাংলা শেখানর উদ্দেশ্যে রচিত। তারপর লোহারাম শিরোরত্ন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ সুধিবৃন্দ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে বাংলাভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের একটী স্বরূপ নির্ণয় করেন।

যাইহোক, একটা কথা আমরা অবশ্যই মানব বাঙালী ছেলেদের বাংলা শেখার জন্য ব্যাকরণ চর্চা করা অপরিহার্য নয়। এছাড়া ব্যাকরণ শেখাবার আরো একটা কারণ সেকালে সব দেশেই মানা হত।

মানসিক শক্তি বিকাশে ব্যাকরণ ?

পূর্বে মনস্তত্ত্ববিদেরা মনকে কতকগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টি বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে এই বৃত্তিগুলি হল অন্য-নিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ—যে কোন বিষয় অবলম্বন করে এই সব বৃত্তির অনুশীলন করলে নাকি তার উৎকর্ষ ঘটে। ব্যাকরণ চর্চার দ্বারা যুক্তি বিচার প্রভৃতি মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন ঘটে সুতরাং ব্যাকরণ চর্চা ব্যাকরণের জ্ঞানার্জনের জন্য যতটা না হোক, মনের এই অতিপ্রয়োজনীয় বৃত্তিটির উন্নতি সাধনের জন্যও বিদ্যালয়ে একান্ত আবশ্যিক হিসাবে গৃহীত হত। বর্তমানে অবশ্য মনের এই বৃত্তিমূলক মতবাদ ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের জ্ঞানার্জন ছাড়া ব্যাকরণ চর্চার অন্য কোন সার্থকতা আজকাল আর কেউ স্বীকার করবেন না। মোটকথা দেখা যাচ্ছে ভাষা জ্ঞানের জন্যও ব্যাকরণ চর্চা

অপরিহার্য নয়, মনের বৃত্তি-বিকাশের জন্যও নয়। তাহলে বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ পঠনপাঠনার প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রয়োজনীয়তা আছে—ভাষা শিক্ষার অপরিহার্য প্রস্তুতির জন্য নয়, তার বিশুদ্ধ ব্যবহারের সহায়ক হিসাবে—

বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের সহায়ক ব্যাকরণ

(ক) মাতৃভাষা আমরা অবশ্য মুখে শুনে লিখি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষা গঠনের বিজ্ঞান জানা থাকলে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ সহজ হয়। (খ) শব্দের বুৎপত্তি জানা না থাকলে কানে শুনে আন্দাজে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায়ই আমরা ভুল অর্থে শব্দ ব্যবহার করে ফেলি, ব্যাকরণ জ্ঞান এই জাতীয় শব্দের অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করে। (গ) ষত্ব ণত্ব ও কৃৎ তদ্ধিতাদি শব্দ গঠন প্রণালীর সূত্র জানা থাকলে বর্ণাশুদ্ধির সম্ভাবনা অনেক কমে। (ঘ) বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য জানা থাকলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারি। (ঙ) বাক্য বিশ্লেষণের কৌশল জানা থাকলে জটিল ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অর্থগ্রহণ সহজ হয়। (চ) বর্তমানের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় ভাষা শিক্ষা দিবার সময় শিশুর বয়স রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন ও তার ক্রমপর্যায় নির্ণয় করতে হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা বিশ্লেষণ না করলে এই জাতীয় শ্রেণীকরণ সম্ভব হয় না। ব্যাকরণ এই কার্যে আমাদের সাহায্য করে। (ছ) সবচেয়ে বড় কথা ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাব্যবহারে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে।

প্রত্যেকটি শব্দ বা বাক্য বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করবার মত জ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ভাষার ব্যাকরণ হল সেই ভিত্তি। এই হিসাবে ভাষাশিক্ষার্থী ব্যাকরণ চর্চার সাহায্যে তার ভাষাজ্ঞানকে সম্পূর্ণতা দান করতে পারবে। শুনে শেখার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আর অনিশ্চয়তা আছে ব্যাকরণ শিক্ষা তা দূর করতে পারবে।

এই হল ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতিটা কি হবে? আগে ব্যাকরণ শিক্ষা হত অবরোহী প্রণালীতে অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্রগুলি প্রথমে মুখস্থ করিয়ে নিয়ে তারপর দৃষ্টান্ত সহকারে তার প্রয়োগ দেখান হত। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা সুরু হবে শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট মানসিক পরিণতির পর। শিশু যখন বিমূর্তচিন্তা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা বিকশিত হয়েছে এবং ভাষা ব্যবহারের কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত করেছে তখনই মাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পাঠ পরিচালনা হবে অবরোহী প্রণালীর পরিবর্তে আরোহী প্রণালীতে অর্থাৎ সূত্র থেকে দৃষ্টান্তে না গিয়ে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাদের সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করে সূত্র নির্মাণ করতে হবে। অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দ বিশ্লেষণ করে তার গঠন কৌশলের দিকে ছাত্রের

ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতি

দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পর তা থেকে সূত্র নির্মাণ করতে হবে ছাত্রের সাহায্যে। পূর্বেই বলেছি, আগে ভাষা তারপর ব্যাকরণ। ছাত্রের পরিচয় ভাষার সঙ্গেই হয় প্রথম। সুতরাং ছাত্রের পরিচিত ভাষা অবলম্বন করে ব্যাকরণের সূত্র সন্ধান করলে তবেই তাতে ছাত্রের আগ্রহ জাগবে এবং ব্যাকরণ শিক্ষা হবে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ, নইলে ব্যাকরণ সূত্রগুলি একেবারেই অর্থহীন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে।

এইভাবে সূত্র নির্মিত হলে তখন তা থেকে অবরোহী প্রণালীতে নূতন নূতন শব্দ বিশ্লেষণ করে সূত্রের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে ছাত্র। প্রয়োগের সাহায্যেই অর্জিত জ্ঞানের উপর ছাত্রের অধিকার জন্মে। সুতরাং কেবল মাত্র সূত্র আবিষ্কার করে ক্ষান্ত না হয়ে নূতন নূতন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে শিখলে তবেই তা ছাত্রের মনে স্থায়িত্ব লাভ করবে।

সর্বশেষ কথা—ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্ন স্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তুটিও শিশুর বুদ্ধি সামর্থ্য ও ধারণাশক্তির স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হবে। তবেই ব্যাকরণ শিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করে ভাষাজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সাহায্য করবে, নচেৎ নয়।

অনুশীলনী

(১) ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা কি? ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবে? (কঃ বিঃ—বি টি ১৯৫৫)

বানান সমস্যা

মানুষ তাহার মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করবার জন্যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে অর্থপূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করে, এবং সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ এই ধ্বনিপ্রবাহ দ্বারাই অপরের সঙ্গে সব সময়ে ভাবের আদান প্রদান করে চলেছে। এই সব অর্থপূর্ণ সাঙ্কেতিক ধ্বনি প্রবাহই হল ভাষা। দেশ কাল ভেদে এই ভাব-সঙ্কেতের পার্থক্য ঘটে—নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আমরা বাঙলা দেশের অধিবাসীরা যে ধ্বনিময় সঙ্কেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি তাই হল বাংলা ভাষা, একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

ভাষার দু'টি রূপ—মৌখিক ও লৈখিক। বর্তমান কাল ও সমুপস্থিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে মৌখিক ভাষা। কিন্তু ভাষার প্রয়োজন ত সেই খানেই ফুরোয় না। অনির্দিষ্ট কাল ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও আমরা অনেক কিছু জানাতে চাই। সেই জন্যে মুখের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি প্রবাহের কতকগুলি লিখিত চিহ্ন আমরা আবিষ্কার করেছি। এই চিহ্ন গুলিকে বলি বর্ণমালা। বিভিন্ন প্রকার ধ্বনির জন্য বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণমালা ব্যবহার করে মৌখিক শব্দকে লিখিত রূপের মধ্যে ধরে রেখেছি। উচ্চারণানুরূপ কতকগুলি চিহ্ন বা বর্ণ সংযোজিত করে শব্দ গঠন করা হয় এবং এই শব্দ গুলিই বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক ভাব প্রকাশের উপাদান।

মানুষ সামাজিক জীব, সেই হিসাবে তার ভাষার একটা সমাজ-গ্রাহ্য রূপ আছে। ভাষাকে লিখিত চিহ্নের দ্বারা স্থায়িত্ব প্রদান করতে হলে ওই চিহ্ন গুলিরও একটা সমাজ-গ্রাহ্য ও সর্বজন-বোধ্য রূপ থাকবার কথা। অর্থাৎ কোন কোন চিহ্নদ্বারা কোন্ কোন্ অর্থের শব্দকে রূপায়িত করা হবে তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে। এই নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলাই হল বানানের নিয়ম। দিবস বুঝাইতে যে 'দিন' লিখব তার রূপ, দরিদ্র বুঝাতে যে দীন লিখব তা থেকে বিভিন্ন হবার কথা। অর্থাৎ শব্দের অর্থ ও রূপের একটা সমাজ-গ্রাহ্য নিয়ম আছে লিখবার সময় সেই নিয়মটি মেনে চললে তবেই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা হয়। এই হিসাবে বানানশুদ্ধি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

ভাষার সর্বজন-বোধ্য রূপ

অথচ বাংলা ভাষার বানানের বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাই নয়, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, এমনকি খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিরাও রচনাতে বহুল পরিমাণে বানান ভুল করে থাকেন।

বানান শুদ্ধি কেন প্রয়োজন ?

সুতরাং এই বানান ভুলের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কি কি কারণে বানান ভুল ঘটে থাকে তাই প্রথমে আলোচনা করতে হয়। তারপর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করব যে বাংলার নিজস্ব কোন বর্ণমালা

নেই। সংস্কৃত তথা দেবনাগরী বর্ণমালাই বাংলার বর্ণমালা রূপে গৃহীত, অবশ্য রূপের বহিরঙ্গ দিকে নয়—উচ্চারণের অন্তরঙ্গ দিকে। সংস্কৃত বর্ণমালা একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুসজ্জিত এবং বর্ণগুলির ধ্বনিও উচ্চারণানুগ। স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা, তাছাড়া শ স ষ—ণ ন—জ য, বর্গীয় ব অন্তস্থ ব ইত্যাদি ব্যঞ্জণবর্ণেরও উচ্চারণ-পার্থক্য আছে। এই হিসাবে শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে লিখলে সংস্কৃতে বানান ভুল হবার সম্ভাবনা কম কিন্তু বাংলার বেলায় সংস্কৃতের বর্ণগুলি সবই আমরা বহন করছি অথচ বাঙালীর জিহ্বায় তার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নাই। নদী ও যদি, কৃশ ও বৃষ, শব ও সব, পদ্য ও চোদ্দ একই ভাবে আমরা উচ্চারণ করি সুতরাং বানানের পার্থক্য গুলি আর শ্রুতিনির্ভর নয়, একান্তভাবেই স্মৃতিনির্ভর। তাই সেগুলি মুখস্থ করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বানান ভুলের কারণ

তাছাড়া বাংলা মিশ্রভাষা, এতে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দের সমাবেশ। মিশ্রভাষার ধ্বনিরূপ অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। স্থিতিশীল বর্ণমালার দ্বারা পরিবর্তনশীল উচ্চারণকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না। দেখা ও লেখা শব্দদুটির লিখিতরূপ এক হলেও উচ্চারণ একরূপ নয়, ঘরের চাল, ডাল ও ব্যবহারের চাল এদের মধ্যে উচ্চারণগত যে সামান্য পার্থক্যটুকু আছে লিখিত চিহ্ন দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা এমন অনেক

শব্দ আজকাল ব্যবহার করছি যার ধ্বনিরূপ আমাদের বর্ণমালায় নেই। তাই পরশুরামকে 'Zানতি' লিখতে হয়েছে, Z সাহায্যে, যদিও একই উচ্চারণের দুটা য ও জ আমরা বহন করি। মোট কথা, বাংলা বর্ণমালায় যেমন অনেক বর্ণ আছে যার উচ্চারণ নেই, আবার এমন অনেক উচ্চারণ আছে যাহার বর্ণ নেই। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। আগেই বলেছি বাংলার শব্দভাণ্ডারে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি নানা জাতের শব্দের সমাবেশ। এইগুলির বানান নিয়ন্ত্রিত হবে কোন ব্যাকরণের সূত্র দিয়ে। কর্ণ বর্ণ হবে বলে কি গভর্ণরে মূর্দ্ধণ্য-এর আধিপত্য স্বীকার করতে হবে? কার্য ও কাজের মধ্যে য ও জর পার্থক্য হল কেন? রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে "যখন শ্রবণ হইতে শোনা লিখিবার সময়ে ন লেখা হয়, মূর্ধণ্য ণ লিখিলে ভুল হয় তখন 'স্বর্ণ' হইতে 'সোনা' যদি ন দিয়া লিখি তবে ভুল হইবে কেন? এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ কেউ বর্ণমালা সংস্কার করিয়া উচ্চারণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে।"

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাংলা ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত তৎসম তদ্ভব শব্দ নিয়ে গঠিত, নূতন শব্দ-গঠনেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃৎতদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের সাহায্য নিতে হয়—সেক্ষেত্রে সংস্কৃত বানান পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটলে ব্যাকরণের সাহায্যে নূতন নূতন শব্দ গঠনে বাধা ঘটবে।

বর্ণমালা সংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের কিছু কিছু সংস্কার করেছেন—এতে বানান অনেকক্ষেত্রে সহজ

হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বানান সংস্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি তৎসম শব্দগুলির মাত্র সংস্কৃত বানান অবিকৃত রেখে দেশী বিদেশী তদ্ভব প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চারণানুগ সহজ বানান প্রচলন করবার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে ধূলা অথচ ধুলো, নীচ অথচ নিচু ব্যবহার করবার কথা। এর ফলে বানান সহজ না হয়ে আরো জটিল হয়েছে কিনা তা ভাববার কথা।

বর্ণমালা সংস্কার

বানান ভুলের আর একটি সর্বাপেক্ষা বড় কারণ বাংলাভাষা, তথা শুদ্ধ বানানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। ইংরাজীতে বানান ভুল করলে আমরা যতটা লজ্জিত হই বাংলা বানান ভুলে তা হইনে। উপরন্তু বাংলা ভাষার অজ্ঞতায় যেন একটা গোপন আত্মশ্লাঘার ভাব দেখা যায়। পূর্বে এভাব যথেষ্টই ছিল সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে তা কিছু কমছে।

তৃতীয় কারণ, বাংলা বানান শিক্ষার অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বানান সমস্যা মৌখিক ভাষার নয়, লিখিত ভাষার। অর্থাৎ কোন কথাকে যখন আমরা লিখিতরূপ দিতে চাই তখনই বানান সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বানান অভ্যাস লিখিতভাবেই করা প্রয়োজন। তাহলে শুদ্ধ বানানের রূপটি আমাদের অবচেতন মনে মুদ্রিত হয়ে যায়, এবং লিখন কালের শুদ্ধ পৈশিক ব্যবহার অভ্যস্থ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্রেরা বানান লিখে অভ্যাস করে না, পড়ে মুখস্থ করে।

চতুর্থতঃ, যে সব শব্দের অর্থ শিশুরা জানে, সেই শব্দগুলিই তার পরিচিত এবং সেইগুলির গঠন কৌশল সম্বন্ধে তারা আগ্রহশীল। শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। শব্দ ভাণ্ডারও বাড়তে থাকে। সেই হিসাবে শিশুকে সহজ সরল পরিচিত শব্দের বানান থেকে সুরু করে ক্রমশ কঠিনতর শব্দের বানান শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা ঝঞ্ঝা, কুজ্ঝটিকা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি দুরুচ্চার্য অপ্রচলিত কঠিন শব্দের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে বানান সম্বন্ধে একটা বিভীষিকার সঞ্চার করে থাকি। বয়সের ক্রমানুসারে শিক্ষণীয় শব্দসম্ভারের কোন তালিকা বাংলাভাষায় নেই। শিক্ষক বর্ণানুক্রম অনুসারে বানান শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং এইভাবে অর্থহীন শব্দ অবলম্বনে বানান মুখস্থ করান হয় বলে ছাত্র বানান সম্বন্ধে কখনই আগ্রহান্বিত হতে পারে না।

যাইহোক বানান ভুলের স্থূল কারণগুলি মোটামুটি ভাবে আলোচিত হল, তারপর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন।

বানান সমস্যার প্রতিকার

প্রথমতঃ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী ছেলেদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সেকথা পূর্বেই বলেছি। বাংলাভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা একান্ত লজ্জার বিষয় বলে মনে করতে হবে। এবং এই হিসাবে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় বাংলা বানানের বিশুদ্ধিরক্ষা অপরিহার্য কর্তব্য বলে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ

বানান শিক্ষার গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক স্মৃতি-নির্ভর পন্থা পরিত্যাগ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। পরিশুদ্ধ লেখনকার্যে ইন্দ্রিয়শক্তি, পৈশিক শক্তি ও স্মৃতিশক্তি যুগপৎ সমবেতভাবে কার্য করে থাকে। পরে অতি-অভ্যাসের ফলে মনের অগোচরে একমাত্র পৈশিক শক্তির প্রভাবেই লিখন কার্য সমাধা হয়ে থাকে। সুতরাং বানান শিক্ষার লক্ষ্যস্থল হল স্বয়ংক্রিয় স্বল্পব্যয়ী পৈশিকশক্তির কৌশলটি আয়ত্ব করা। এই কাজটি শুধু মুখস্থ করে করা যায় না, পৈশিকশক্তি ব্যবহারেই করতে হয়—অর্থাৎ বানান লিখে অভ্যাস করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখবার প্রয়োজন। শিক্ষার মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়টির অনুশীলনে যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায়, শিক্ষা ততবেশী দ্রুত ও সফল হয়। বানান লিখবার সময়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বানান করে পড়া যায় তাহলে পেশীশক্তি, বাচনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যুগপৎ ব্যবহার করতে করতে বানান সহজে অভ্যস্থ হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, বয়স অনুসারে বা শিক্ষার মান অনুসারে ব্যবহৃত শব্দের একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রণয়ন করতে হয় এবং সেই তালিকার শব্দ দিয়েই বানান শিক্ষা সুরু করতে হয়। যে সব শব্দ অপ্রচলিত, অব্যবহৃত, বা ছাত্রের অজ্ঞাত, সে সব শব্দের বানান চর্চা করে লাভ নেই।

চতুর্থতঃ, শব্দগুলি শিশুর কাছে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অবস্থাতেই আসে। এই হিসাবে প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে শিশুর মানসিক পরিমণ্ডলে বাক্যঘটিত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শব্দকে সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে দেখলে তার আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বাক্যের পটভূমিতে রেখেই শব্দের বানান চর্চা করা ভাল।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভাবন (suggestion) ক্রিয়ার প্রভাব সব সময়েই মনে রাখতে হবে। শিক্ষকের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ শিশুর মনে অত্যন্ত প্রবল অনুভাবনের কাজ করে। সেই হিসাবে শিক্ষকের বানান ভুল হলে তার ফল হবে মারাত্মক, ছাপার বইয়ের ভুলও এই দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ছাপার অক্ষরে যা বের হয় তা অমোঘ সত্য—শিশুদের পক্ষে এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, অথচ বর্তমানে পাঠ্য পুস্তকগুলিতে অনবধানতা-ঘটিত ছাপার ভুল এত বেশী থাকে যে আর বলে শেষ নেই। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

পথে ঘাটে সাইনবোর্ডে কত বিচিত্র রকমের বানান ভুল তার বৃহৎ আয়তন নিয়ে দিবারাত্র ছাত্রদের মনে কত যে ভুল ছবি এঁকে দিচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

ষষ্ঠতঃ, ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার সময়ে বানানের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে এবং পঠিত গদ্যপদ্য থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ব্যাকরণের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে

ভাল ফল পাওয়া যাবে। ব্যাকরণেকে পাঠ্য গদ্যপদ্য থেকে স্বতন্ত্র করে যে ভাবে পড়ান হয় তাতে ছাত্রের কাছে ব্যাকরণের সূত্রগুলি কতকগুলি নীরস তত্ত্ব রূপেই দেখা দেয়, বানান নির্ধারণের তথ্য হিসাবে দেখা দেয় না। ব্যাকরণ ও সাহিত্য অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation of study) শিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যায়।

সপ্তমতঃ, শ্রুতিলিখনের কথা। বানান চর্চায় শ্রুতিলিখনের বিশেষ উপযোগিতা আছে। শ্রুতিলিখন অবশ্য দুই প্রকার—শিক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলক।

শিক্ষামূলক শ্রুতিলিখনে লেখ্য বিষয়টি প্রথমে কয়েকবার ছাত্রের কাছে পড়িয়ে শুনাতে হয়। বলাই বহুল্য এই বিষয় বস্তুটির মধ্যে অপ্রচলিত অব্যবহার্য কঠিন শব্দ থাকবে না।

শ্রুতিলিখন

তারপর এই শব্দগুলির মধ্যে থেকে বানানের বৈশিষ্ট্য যুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। অতঃপর বোর্ডের লেখা মুছে দিয়ে ছাত্রকে শ্রুতিলিখন লিখতে দেওয়া হবে। রচনার প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে হয়, কিন্তু বার বার পুনরাবৃত্তি করা ভাল নয়। শ্রুতিলিখনের পর লিখিত রচনাটি আদর্শ রচনার সঙ্গে মিলিয়ে ছাত্রের দ্বারাই সংশোধন করে নেওয়া ভাল।

পরীক্ষামূলক শ্রুতিলিখনে পূর্ব হতেই শব্দের বানান সম্বন্ধে অবহিত করে তুলবার প্রয়োজন নেই। তবে শ্রুতিলিখনের

আদর্শ রচনা নির্বাচনের সময় অপুর পাঠশালার প্রসন্ন পণ্ডিত মশায়ের মত "জলধর পটল" সংযোগ করলে চলবে না। ছাত্রের জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই শব্দব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে।

এই ভাবে প্রথম থেকেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক পন্থা অনুসরণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে বানান ভুলের সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে সমাধান হতে পারে, নচেৎ নয়।

অনুশীলনী

১। কি কি কারণে বানান ভুল হয়, বানান ভুল সংশোধনের উপায় কি? কয়েকটি ভুলের উল্লেখ কর এবং সেগুলি কিরূপে সংশোধন করিবে লিখিয়া দাও—

[কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৪৭]

… … বি. টি. ১৯৫২

২। বানান ভুল, বাক্য বিন্যাসের ত্রুটি, অনবধানতা,…ইত্যাদি দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহা বিবৃত কর—

[কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৫৩]

৩। ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা রচনায় কি ধরণের বানান ভুল করে? কিকি কারণে বর্ণাশুদ্ধি হয়, ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

[কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৫৫]

রচনা শিক্ষা

রচনা শব্দটির অর্থই হল কোন কিছু নির্মান করা—মাল্য-রচনা, শয্যা রচনা থেকে শুরু করে বাক্যরচনা প্রবন্ধরচনা সব কিছুই হল বিভিন্ন উপাদানের সাঙ্গীকরণে নতুন কিছু গড়ে তোলা। এই গড়ে তোলার প্রবৃত্তি মানুষের একেবারে সহজাত মৌলিক প্রবৃত্তি।

মানব শিশু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই কত বিচিত্র উত্তেজনা তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে এসে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুলছে—অন্তরের কত বিচিত্র ভাবের উদ্ভবে অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ঘটছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই যোগাযোগ স্থাপনের প্রধান উপকরণই হল মানুষের ভাষা। ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার ভাব ও কর্মের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, অন্তর্লোকের সঙ্গে বহির্লোকের যোগাযোগ গড়ে তোলে। ভাষার কাজ দ্বিমুখী—একমুখে অপরের চিন্তা ভাবনাকে মানুষ নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। আর এক মুখে নিজের নিজের চিন্তাধারাকে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করে। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা থেকেই রচনার উদ্ভব। রচনার মধ্যে দিয়েই মানব তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সাধারণের নিকট পরিবেশন করে।

রচনার এই ব্যাপক অর্থ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার উপায় হিসাবে এর যে একটি বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা হয় সেই অর্থেই আমরা বর্তমানে রচনা শিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করব।

শিশু প্রথমে কয়েকটি বিভিন্ন শব্দ শেখে। তারপর শব্দের বিভিন্ন টুকরা গুলো জোড়া দিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশ তৈরী করতে শেখে,—বিভিন্ন শব্দার্থগুলি তখন বাক্যের মধ্যে ক্রমশ একটা সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে।—এই হল রচনাশিক্ষার গোড়ার কথা।—শিশুর এই স্বাভাবিক প্রচেষ্টা অনুশীলনের দ্বারা আরো মাজিত করা যায়। —শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে; গল্প বলতেও তেমনি ভাল বাসে।—সুতরাং গল্পবলার উপলক্ষ্য করে শিশুদের রচনাশক্তির অনুশীলন করা যেতে পারে। গল্পবলাই হল শিশুদের মৌখিক রচনা।—এর দ্বারা শিশুর কল্পনাশক্তি বা রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—

মৌখিক রচনা

এছাড়া কয়েকটি ছবি দেখিয়ে সেই ছবি অবলম্বনে গল্প রচনা করতে দেওয়া যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর শিশুদের এইভাবে কল্পনা শক্তি উদ্বোধিত করা ভাল।—

বড়দের বেলায় রচনাশিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও চিন্তাশক্তির পরিমার্জনা সুন্দর ভাবে ঘটে। মনের অনেক আকাঙ্ক্ষা রচনার বক্তব্য বিষয় অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় এবং সৃষ্টিধর্মী কল্পনাবৃত্তির সার্থক অভিব্যক্তি হয়। বড়দের বেলায় মৌখিক রচনার পরিবর্তে লিখিত রচনা প্রয়োজন।—এক্ষেত্রে

CAUTION:

Image 99 is NO longer present in scan-order!

Maybe it was deleted from outside of BCS-2 ?

শুধু কল্পনাবৃত্তির নয়, সেটিকে স্থায়ীরূপ দেবার মত পৈশিক শক্তির অনুশীলনেরও প্রয়োজন। অতঃপর রচনার গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠ উপাদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বিষয়বস্তুর কথা চিন্তনীয়। বিষয়বস্তুটি যেন যথোপযুক্ত তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং যুক্তিবিন্যাসের ধারায় যেন ভাবের পারম্পর্য অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় কথা রচনার বিষয়টিকে সামগ্রীকভাবে বিচার করে দেখতে হয়, কোনও একদিকে পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে রচনার সৌন্দর্যের হানি ঘটে। তারপর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে—রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষা নির্বাচন। রচনার বিষয়বস্তু যাই হোক, সহজ সরল সবলীল ভাষার টানে অনেক দুরূহ বিষয় সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে।

রচনা শক্তির অনুশীলনা

শেষকথা—রচনায় প্রাঞ্জলতা সরলতা এবং আনুপূর্বিক একটা সঙ্গতিপূর্ণ রচনাশৈলী থাকা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"রচনার প্রথম গুণ ও প্রথম প্রয়োজন,—সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বোঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা। তাহার পর ভাষার সরলতার ও স্পষ্টতার সঙ্গে সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।—"

এইবার রচনার দোষ ত্রুটির কথা।—দোষকে দুদিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে—এক, বিষয়বস্তু ঘটিত এবং অপর, ভাষা ও রচনা-শৈলী ঘটিত। এই দুটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।—

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান অর্জন না করেই ছেলেরা আবোল-তাবোল যা তা লিখে যায়। কখনও বা রচনা-পুস্তক থেকে কতকগুলি সত্যমিথ্যা তথ্য না বুঝে গলাধঃকরণ করে রচনায় বসিয়ে যায়,—তার ফলে রচনা হয়ে ওঠে একেবারেই অর্থহীন কৃত্রিম ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।

রচনার দোষত্রুটি

রচনাশৈলীর ত্রুটি আরো মারাত্মক—প্রধানতঃ বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণঘটিত ভুলের ফলে রচনা প্রায়ই অপাঠ্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং রচনা লেখা অভ্যাস করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে—

প্রথমতঃ, যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে সে সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সেটুকু আগেই ভাল করে জেনে নিতে হবে, সমস্ত কিছুই নিজের অভিজ্ঞতায় থাকবার কথা নয়। বই থেকে পড়ে তারপর সেগুলি নিজে বেশ করে চিন্তা করে বুঝে নিয়ে অবশেষে রচনা লিখবার জন্য তৈরী হতে হয়।

শিক্ষক মহাশয়ও শ্রেণীতে কোনও রচনা লিখতে দিলে তিনি সে সম্বন্ধে শ্রেণীতে আলোচনা করবেন এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় সঙ্কেত নির্দেশ করবেন। প্রয়োজন হলে ২।১ খানি পুস্তকের অংশ বিশেষের কথা উল্লেখ করবেন, যা থেকে ছাত্ররা নিজেরাই প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এইভাবে রচনার মালমসলাগুলি সংগৃহীত হলে পরে সেগুলিকে এমনভাবে গুছিয়ে সাজাতে হবে যাতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা থাকে—

রচনা লেখার পদ্ধতি

এলো-মেলো না হয়ে যায়। সেইজন্য সমস্ত বিষয়টি কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের জন্য এক একটি গূঢ় সঙ্কেত (point) ভেবে নিতে হয়, পরে সেই সঙ্কেত গুলিকে বাড়িয়ে লিখলেই রচনাটি সম্পূর্ণ হতে পারবে। সঙ্কেত বাড়ানোর সুবিধার জন্য প্রত্যেক সঙ্কেতের কতকগুলি প্রশ্ন করা যেতে পারে। ঐ প্রশ্নের উত্তর থেকেই রচনার বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে।

অনুচ্ছেদ সাজানোর মধ্যেও কিছু চিন্তা করতে হয়। যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি প্রথম দিকে বলাই ভাল। শেষাংশে নিজস্ব মতামত বা মন্তব্য কিছু বলতে হয়। মাঝখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে সাজাতে হয়।

এই হল বিষয়বস্তুর কথা—এরপর ভাষাশৈলীর কথা। ভাষা ও রচনা ভঙ্গীর ত্রুটিই হল সবচেয়ে মারাত্মক। বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণগত ভুলের জন্য রচনা প্রায়ই অপাঠ্য হয়ে ওঠে। রচনা লিখবার সময়ে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের কঠিন বা জটিল বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে দিতে হয় না—এবং তাদের ভাষাও সহজ সরল হওয়াই স্বাভাবিক। মনের ভাবটি ছোট ছোট বাক্যে প্রকাশ করতে হয়, বড় বাক্যকে ভেঙ্গে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করলে ভাল। ছাত্রদের অনেক সময় গালভরা কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। তার ফলে গুরুচণ্ডালী দোষ ত হয়ই। কখন কখন শব্দের হাস্যকর অপপ্রয়োগও দেখা যায়।

অনেকে রচনাটি প্রথমদিকে রীতিমত গুরুগম্ভীর ভাষায় আরম্ভ করে আর শেষ রাখতে পারে না—তার ফলে রচনাটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

রচনার আর এক বড় ত্রুটি সাধুভাষার ও চলিত ভাষার অবাধ মিশ্রণ। সাধুভাষার রচনা ভাল, চলিত ভাষার রচনাও আজকাল সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে—রচনায় যে কোন একটি বেছে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু দুয়ের মিশ্রণ হয়ে গেলেই রচনাটি নষ্ট হয়ে গেল। চলিত ও সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চলিত ভাষায় আগাগোড়া সমানভাবে রচনা করা সহজ নয়,—বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ। সেজন্য প্রথম প্রথম সাধু ভাষায় রচনা লিখতে অভ্যাস করাই ভাল।

অনুশীলনী

১। রচনা সুন্দর করিয়া শিখাইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবে তাহা লিখ— (কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৯)

২। রচনা শিখাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তোমার যাহা মনে হয় তাহা বিশদভাবে লিখ— (কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫১)

৩। ভাষা শিক্ষা এবং রসবোধের পক্ষে রচনাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর রচনার লক্ষণ কি তৎসম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর— (কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৩)

৪। মৌখিক রচনার স্থান বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে আছে কি? রচনা শিক্ষাদান কালে মৌখিক ও লিখিত কার্যের সম্পূর্ণ বিচার কর— (কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৬)

———

অনুবাদ শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুখে যত বড় বড় কথাই বলি সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ইংরাজের অফিসে সুদক্ষ কেরাণী তৈরী করা। এবং শিক্ষার সমগ্র কাঠামোটাই সে দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে মাধ্যমিকস্তরের পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার মধ্যে দিয়ে ইংরাজী শেখানোর প্রচেষ্টাই সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বাহন ছিল ইংরাজী, সুতরাং ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি যাই শিক্ষা দেওয়া হোক সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হয়ে যেত এবং ইংরাজী ভাষায় ভাল রকম দখল না হলে ঐ সকল বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হত না। বিপদ হল বাংলাকে নিয়ে। বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে ত ইংরাজী মাধ্যম অবলম্বন করা যায় না সম্ভবতঃ তাই অনুবাদ শিক্ষার শরণ নেওয়া হল। ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ বাংলা শিক্ষার অনেকখানি স্থান জুড়ে রইল। কিন্তু অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কি বাংলা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাই? প্রকৃত পক্ষে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে দখল না থাকলে অনুবাদ করা যায় না। ইংরাজী শব্দার্থ, চলিত বাগভঙ্গী, প্রকাশ কৌশলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান থাকলে তবেই

অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-অতীতে

অনুবাদ করা যায়। সুতরাং অনুবাদ শিক্ষা বাংলা ভাষা শিক্ষায় যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে অনেক বেশী করে ইংরাজী শিক্ষায়। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে অনুবাদ শিক্ষাকে মাতৃভাষা শিক্ষার অঙ্গীভূত করে রাখবার কোন হেতু নেই।

কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে দেখলে অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। অনুবাদের মধ্যে দিয়েই এক দেশের ভাবসম্পদ অন্য দেশের ভাণ্ডারে এসে জমা হয়, ভাণ্ডার ভরে ওঠে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যা কিছু মূল্যবান কথা কেউ বলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মনন ক্ষেত্রে আমদানি করতে হলে অনুবাদের তরণী বেয়েই তাদের আনতে হবে। তাতে দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। মাতৃভাষায় দেশবাসীর শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, দেশের সাহিত্যও শ্রীমণ্ডিত হবে। এই দিক দিয়ে ইংরাজী ভাষার ও সাহিত্যের তুলনা নাই। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের ভাবধারা অনুবাদের খাত চেয়ে আজ ইংরাজী সাহিত্যের মহাসাগরে এসে মিলিত হয়েছে। আমরা বাঙালীরা সেই মহাসাগরের কয়েক অঞ্জলি জলপান করেই বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু বর্তমানে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার সার্বভৌমত্ব আর আমরা স্বীকার করিনে। মাতৃভাষা তার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে আত্মমর্যাদার গৌরবময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন এই আমাদের কামনা। সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞান

ভাণ্ডারের পরিচয় মাতৃভাষার মধ্যেই যাতে পাওয়া যায় অনতিবিলম্বেই তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এই দিক দিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে অনুবাদ কার্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। বিদেশী সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য, রচনা কৌশল ও কলাশৈলী অনুবাদের মধ্য দিয়ে যথোচিত পরিমানে উপভোগ করতে গেলে সেই অনুবাদ কার্যও রসোত্তীর্ণ শিল্পকলা হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। অনুবাদ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন সাহিত্যের রসবস্তু অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকার মত, একভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্যভাষার অন্তঃপুরে আনতে গেলে স্বভাবতই তার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যায়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। এই লজ্জাটি যিনি যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়ে রসের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেন তিনি সেই পরিমাণে সার্থক অনুবাদক। সুতরাং এই অনুবাদ কার্য একটি শিল্পকলা এবং বলাই বাহুল্য তা' যথোচিত পরিমাণে চর্চা-সাপেক্ষ। সাহিত্যের রসপুষ্টি ছাড়া জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনুবাদের সার্থকতা বড় কম নয়। বাংলা সংবাদপত্র-অফিসে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা জানেন দেশ-

অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বর্তমানে

বিদেশ থেকে আজও ইংরাজী হিন্দী ও বিভিন্ন ভাষায় যে সব বক্তৃতা ও আলোচনাদি চলছে বাংলা ভাষায় তার দ্রুত রূপান্তর করে ফেলবার প্রয়োজনীয়তা থেকেও অনুবাদ কার্যের গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারব।

এই সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে অনুবাদ শিক্ষার আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করতে পারব না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যেই অনুবাদ শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবার প্রয়োজন।

এখন এই অনুবাদ শিক্ষাদান কার্য কিভাবে পরিচালিত হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যটি সহজে সফল হতে পারে সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ—কোন সময় থেকে তা সুরু করা যেতে পারে তাই বিবেচ্য? ছাত্র যখন ইংরাজী পাঠে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, প্রচলিত ইংরাজী শব্দের মোটামুটি অর্থ শিখেছে এবং ইংরাজী বাক্য গঠনের কৌশল সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা হয়েছে সেই সময়েই অনুবাদশিক্ষার কাজ সুরু হতে পারে।

তারপর, ছাত্রের ইংরাজী ভাষা জ্ঞানের পরিধি যতটুকু অনুবাদকে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। অর্থাৎ পূর্বার্জিত ইংরেজী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই অনুবাদ কার্য সুরু হবে। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করে এই কার্য সহজে করা যেতে পারে। তারপর অনুবাদের কৌশল কিছু পরিমাণে অধিগত হলে অন্য পুস্তক থেকে বা ওই ধরণের সহজ ইংরাজী রচনার অংশ বিশেষ থেকে অনুবাদ করতে দেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজন হলে কঠিন ইংরাজী শব্দগুলির অর্থ বলে দেওয়া বা বোর্ডে লিখে দেওয়া ভাল। ইংরাজী বাগধারা (idiom) ইত্যাদির প্রতি, প্রয়োজন থাকলে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

তদনুরূপ বাংলা বাগধারা কি হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

এইভাবে অনুবাদ কার্যের কাঠামোগঠন শিক্ষা ভালভাবে পোক্ত হলে তাকে কিছু রস-সম্পৃক্ত করে তুলতে শিক্ষা দিতে হবে। আদর্শ অনুবাদ অর্থে কেবলমাত্র অর্থান্তর করা নয়, তার মধ্যে সাহিত্যরস সঞ্চার করে তাকে একেবারে সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করা। এই কার্যের জন্য ভালভাল সাহিত্যরস-সম্পৃক্ত আদর্শ অনুবাদের অংশবিশেষ ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনান প্রয়োজন, এবং উভয় ভাষার বাক্য-গঠনগত পার্থক্য ও বাগধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করে তুলবার প্রয়োজন। আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও রসানুবাদ কোনটা কিভাবে করতে হয় দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনুবাদ যতটা মূলানুরূপ হয় ততই ভাল, তবে অনেক ক্ষেত্র আক্ষরিক অনুবাদে রচনা একান্তই কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট, এমনকি অর্থহীন হয়ে পড়ে—সেক্ষেত্রে সরল স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ করাই বাঞ্ছনীয়। অনুবাদ কার্য কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে বিচার করতে হলে অনুদিত বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে পড়ে দেখতে হয়, তাতে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুবাদের মধ্যে কতটুকু ফুটে উঠেছে তা বুঝতে পারা যায়।

শ্রেণীতে পাঠদান কালে অনুবাদ শিক্ষার কার্য কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্বন্ধে একটা পাঠটীকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

অনুবাদ শিক্ষার পদ্ধতি

প্রথমতঃ, আয়োজন পর্যায়ে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে নিতে হবে। ইতিপূর্বে কোন্ মান পর্যন্ত অনুবাদ কার্য ছাত্র করেছে তা না জানলে নূতন পাঠ কোন মান অনুযায়ী হবে তা বুঝতে পারা যাবে না।

তারপর অনুবাদের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছোটখাট একটু ভূমিকা করবার প্রয়োজন। বক্তব্য বিষয়ের একটু মোটামুটি ধারণা পূর্ব থেকেই থাকলে বিষয়বস্তুর মর্ম গ্রহণ করা সহজ হয় এবং তাতে অনুবাদ-রচনাটি রস-সম্পৃক্ত করা যায়। দু'একটি শব্দের অর্থ জানা না থাকলেও বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ উপস্থাপন পর্যায়ে অনুবাদের মূল বিষয়বস্তুটি শিক্ষক ধীরে ধীরে সরব-পাঠ দিবেন। তারপর প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের অন্তর্গত দুরূহ শব্দ, অভিনব বাকভঙ্গী ও বিচিত্র বাগধারার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কোন কোন অংশে শাব্দিক অনুবাদ অর্থহীন হয় এবং সেইখানে কেমন করে ভাবানুবাদ করতে হয় সে সম্বন্ধে ছাত্রদের লক্ষ্য করতে বলবেন।

তৃতীয় সোপানে অর্থাৎ অভিযোজন পর্যায়ে গিয়ে ছাত্র বিষয়টির অনুবাদ করবে।

এইভাবে অগ্রসর হলে অনুবাদ কার্যের কৌশলটি ছাত্রেরা সহজেই শিখতে পারবে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি আদর্শ

অনুবাদ দৃষ্টান্তস্বরূপ পড়ে শোনালে ভাল হয়। তাহলে অনুবাদ রচনাকেও যে কতখানি রসোত্তীর্ণ করা যায় সে সম্বন্ধে ছাত্রেরা অবহিত হবে।

অনুশীলনী

১। ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ করিতে ছাত্র ছাত্রীদের শিখান হয়। ইহার দোষগুণ আলোচনা কর। [কঃ বিঃ বি.টি. ১৯৫০]

২। ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অনুবাদ শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদের উৎকৃষ্ট প্রণালীটি দেখাইয়া দাও। [কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৫২]

৩। ভাষাশিক্ষায় অনুবাদ শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি? বঙ্গানুবাদ যাহাতে নির্দোষ হয় তাহা শিখাইবার জন্য কি কি নির্দেশ দিবে?

[কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৫৪]

৪। শিক্ষার দিক দিয়া ভাষা ও সাহিত্য পড়াইবার সময়ে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা কি? যদি প্রয়োজন থাকে তবে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে? [কঃ বিঃ বি. টি. ১৯৫৮]

ছন্দ

জগৎ ছন্দময়। নক্ষত্র সূর্যাদি মহতোমহীয়ান থেকে সুরু করে অনোরনীয়ান পরমাণু পর্যন্ত সব কিছু ছন্দে ছন্দে আবর্তিত। মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস রক্তসঞ্চালন হৃদস্পন্দন সবই চলেছে ছন্দের তালে তালে। কি বস্তুজগতে কি ভাবজগতে সর্বত্রই মানুষের বিকাশ ছন্দময়। তাই মানব জীবনের সকল মাধুর্য সকল সৌন্দর্য সকল আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যখন সে থাকে স্বচ্ছন্দে। সৃষ্টির কোন আদিকালে প্রথম জীব-কোষটি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হতে হতে তার জীবন পরিক্রমা সুরু করেছিল। তারপর কত যুগযুগান্ত ধরে বিচিত্র জীবকোটি পরিভ্রমণ করে আজ সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে—কিন্তু এখনো তার দেহের প্রতিটি জীবকোষে সেই অতীত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অসীম আনন্দ। ছন্দের প্রতি মানুষের তাই স্বাভাবিক আকর্ষণ; ছন্দের মাধ্যমে মানুষের আনন্দোচ্ছ্বাস।

প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে, তাতে তার দৈনন্দিন কাজকারবার চলে, কিন্তু আনন্দের তাগিদে শিল্পী মানুষ সেই ভাষায় ছন্দযোগ করেছে তাতে তার আনন্দময় সত্তার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাজের মানুষ ঘট তৈরী করে জল খাবার জন্য, শিল্পী মানুষ তার গায়ে নকশা আঁকে আনন্দলাভের জন্য। অর্থ দিয়ে ঘেরা কথার বন্ধন শিথিল

করে ভাবের মুক্তি দেয় এই ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—"আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে গাঁথা। কিন্তু এ কেবল বাইরের বাঁধন অন্তরের মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দে ছন্দে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে—" মুখের কথা ছন্দের সাহায্যে মর্মের কথা হয়ে ওঠে।

এইজন্য কাজের ভাষাকে মানুষ যখনই আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে তখনই তার প্রকাশ ঘটেছে ছন্দবদ্ধ কবিতায়। শিশু প্রথম কথা বলতে শিখেই দুলে দুলে ছড়া আবৃত্তি করে। শিশুদেবতার প্রতি বিমুগ্ধ মাতৃহৃদয়ের প্রথম স্তবগান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ছেলেভুলান ছড়ায়। ছড়ার ছন্দবৈচিত্র্য ও ধ্বনিসুষমাই প্রধান হয়ে শিশু চিত্তকে অভিভূত করে দেয়। অর্থ সেখানে একেবারেই অনর্থক। ছন্দের ঝঙ্কারেই শিশু পুলকিত হয়ে ওঠে। বিচিত্র শব্দপুঞ্জের পরিমিত আবর্তনের হিল্লোলে শিশুর সমগ্র দেহমনে একটা জৈব আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ছন্দ ও অর্থ মিলে হয় কবিতা, তার মধ্যে ছন্দের আবেদন দেহগত জৈব আনন্দের কাছে আর অর্থের আবেদন ভাবগত বৌদ্ধ আনন্দের কাছে, সুতরাং শিশুর স্বাভাবিক

ছন্দের আনন্দ

আকর্ষণ ছন্দের প্রতি, পরিমিত পদবিন্যাসের হিল্লোলের প্রতি। কবিতার সহজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি-ব্যঞ্জনাময় সরব পাঠে অর্থাৎ সুষ্ঠু আবৃত্তির ফলে কাব্যের ভাষার যে একটি নৃত্য-পর সঙ্গীতমধুর তরঙ্গময় প্রবাহের সৃষ্টি হয় তারই উচ্ছ্বাসে শ্রোতার সমগ্র দেহমন আনন্দাপ্লুত হয়ে ওঠে।

সুতরাং ছন্দের এই স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির কথা স্মরণ রেখে বিদ্যালয়ে কবিতা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হয়। সমস্ত কবিতাই যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা ছেলেদের বুদ্ধিগোচর করে তুলতে হবে, এমন কি কথা আছে? ছন্দহিল্লোলের আনন্দ দানও অনেকক্ষেত্রে কবিতা পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঝর্ণা কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি। কবিতাটি অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের এমন সব শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উৎকলিত হতে দেখা যায় যাদের পক্ষে এই কবিতার অর্থবোধ সম্ভব নয়। কিন্তু ছন্দ ঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার উপলব্যথিত গতিপ্রবাহটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সেটা কিন্তু অনুভব করতে পারে সকল শ্রেণীর ছেলেই। এখানেই হল ছন্দের যাদু।

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে……ইত্যাদি

কবিতাটির প্রত্যেক শব্দের অর্থ শিশু তন্ন তন্ন করে না বুঝলেও এর ছন্দ তার প্রাণে দোলা দেয় এবং আবছা যা বুঝবে কাব্যরস সঞ্চারের পক্ষে তাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"—কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নয়। প্রাণের মধ্যে ঘা' দেওয়া—" এই ঘা দেওয়ার কাজে ছন্দের দোলা সবচেয়ে কার্যকরী।

ছন্দের এই প্রচণ্ড আনন্দ মধুর আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয় নিশ্চয়ই অবহিত হবেন। এই শক্তির উৎস কোথায়, কি বিচিত্র এর অভিব্যক্তি, কি মধুর এর আবেদন সমস্তই সম্পূর্ণ ভাবে না জানা থাকলে কবিতা পাঠের দ্বারা শিক্ষক মহাশয় কখনই আশানুরূপ আনন্দ সঞ্চার করতে পারবেন না। সুতরাং

শিক্ষকের ছন্দ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষার শিক্ষককে বাংলা ছন্দ বিজ্ঞানের মূলসূত্র ভাল করে জেনে রাখতে হবে। কত বিচিত্র ধরণের পদ বিন্যাস, ছেদ বিন্যাস ও শ্বাসাঘাত জনিত ধ্বনিতরঙ্গ বাংলায় কত নূতন নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেছে, কি তাদের লক্ষণ' কোথায় তাদের সৌন্দর্য, কোনখানে তাদের বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত জানা থাকলে তবেই শ্রেণীকক্ষে কবিতার রস সঞ্চারী পাঠদান করা সম্ভব। বলাই বাহুল্য ছন্দ বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য নয় সুতরাং শিক্ষক ছন্দ চর্চা করবেন ছাত্রকে ছন্দ বিজ্ঞান বোঝানর জন্য নয়, ছন্দের গীতিমাধুর্য উপভোগ করানর জন্য। কবিতা পঠন-পাঠনের জন্য তাই ছন্দজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য।

ছন্দ লিপিগ্রাহ্য নয়, শ্রুতিগ্রাহ্য অর্থাৎ ছন্দের বিচার

লেখা দেখে নয়, পড়া শুনে। শব্দের উচ্চারণভঙ্গীর উপর নির্ভর করে ছন্দবৈচিত্র্য। অথচ বাংলা বর্ণ উচ্চারণের কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। প্রয়োজনমত এবং ইচ্ছামত বাংলার বর্ণ হ্রস্ব বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে দেখলে বাংলার ছন্দ বিচার জটিল। বাংলাভাষার ছান্দসিকদের মধ্যে তাই মতভেদেরও অন্ত নেই। বর্তমান প্রবন্ধে ছন্দ বিচারের সেই জটিলতত্ত্ব আলোচনা করবার সময় বা সুযোগ নেই। ছন্দ বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পুস্তক থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে পারেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে ছন্দ বিচারের মূলসূত্র সম্বন্ধে কয়েকটি মোটাকথা আলোচনা করেই আমাদের ক্ষান্ত হতে হবে।

আগেই বলেছি, ছন্দ হচ্ছে পরিমিত শব্দবিন্যাসউদ্ভূত ধ্বনি হিল্লোল। কিন্তু এই পরিমিতি কিসের উপর নির্ভরশীল?

বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ করলে ছন্দের উপাদান হিসাবে দেখা যাবে অক্ষর মাত্রা, পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি ··

অক্ষর বলতে সাধারণতঃ আমরা তা' বর্ণের সঙ্গে অভিন্নার্থ বলে মনে করি, কিন্তু ছন্দ বিচারে অক্ষর হল উচ্চারণ-সাধ্য সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ধ্বনি অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে সিলেবল্ (Syllable) যেমন 'চন্দনে' দুটো অক্ষর চন্ ও দন্। অক্ষর স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত দুই-ই হতে পারে, যথা জান্‌লা। জান্ ব্যঞ্জনান্ত এবং লা স্বরান্ত।

মাত্রা হচ্ছে অক্ষর উচ্চারণের সময়ের মাপ। একটা অক্ষর

উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকুই হচ্ছে একমাত্রা। সংস্কৃতে বা বাংলায় কোন কোন ছন্দ বিচারে হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা বলে ধরা হয়। কিন্তু বাংলার স্বরবর্ণ হ্রস্বদীর্ঘ মেপে উচ্চারিত হয় না তাই বাংলার ছন্দ এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। 'দেশ দেশ নন্দিত করি'র' "দে" এবং 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে'র "দে" সমান মাত্রার নয়। অথচ নদী ও যদির শেষ অক্ষরটি হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে একমাত্রার। এর ফলেই বাংলা কবিতায় ছন্দ বিজ্ঞান জটিল হয়ে উঠেছে।

এরপর **যতির** কথা। আমরা কখনই একটানা কথা বলে যেতে পারি না, শ্বাসগ্রহণের জন্য মাঝে মাঝে থামতেই হয়। বাক্যের মধ্যে এই স্বল্প বিরতির নাম হল যতি। গদ্যে এই যতির কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, কিন্তু পদ্যের বেলায় সুনির্দিষ্ট অক্ষরের পর শ্বাসবায়ুর বিরাম হবেই। এই সুনিয়মিত যতির ফলেই ছন্দের ওঠানামা, ছন্দের তরঙ্গ। এই যতি বা বিরতি দুই কারণে ঘটে—এক অর্থানুসারে, আরেক ছন্দানুসারে।

বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য

অর্থানুসারে থামলে তাকে বলা যায় অর্থ-যতি বা ভাবযতি এবং অপরটি ছন্দযতি। অবশ্য অর্থানুযায়ী বিরতির নাম হল ছেদ। অর্থাৎ অর্থবোধক বিরতি হল ছেদ আর ছন্দবোধক বিরতির নাম হল যতি।

যথা— কবে পড়িবে বেলা | ফুরাবে সব খেলা।
নিবাবে সব জ্বালা | শীতল জল ॥

এখানে ভাবযতি ও ছন্দযতি একই সঙ্গে পড়েছে

অথচ— ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি—

এখানে ছন্দ যতির সঙ্গে যে ভাব যতির মিল নাই তা ত দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

পর্ব—

একটি ছন্দ পংক্তিকে যতি দ্বারা খণ্ডিত করলে এক একটি খণ্ডকে বলা হয় পর্ব, অর্থাৎ কবিতা পড়বার সময় এক ঝোঁক থেকে আরেক ঝোঁক অবধি যে অংশটুকু থাকে, তাই হল পর্ব। যতি কবিতার ধ্বনিপ্রবাহকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমিতি দান করে, এবং সেই পরিমিত খণ্ডই হল পর্ব।

। । । । । । । । । । । । । । ।
কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে । কহে বেদব্যাস ॥ ৮ + ৬

। । । । । । । । । । । । । ।
চৈতন্য লীলায় ব্যাস । বৃন্দাবন দাস ॥ ৮ + ৬

এখানে প্রত্যেক চরণে দুটি করে পর্ব। প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা ও দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্রা। ৮ মাত্রার পর্বটি আবার দুটি করে চার মাত্রার-খণ্ডে ভাঙ্গা যায় (কৃষ্ণলীলা। ভাগবতে ॥ চৈতন্য লী। লায় ব্যাস।) এই খণ্ডপর্বগুলিকে পর্বাঙ্গ বলা যায়।

বাংলা কবিতায় সাধারণতঃ চার থেকে দশ মাত্রার পর্ব দেখা যায়। অনেক সময় শেষ পর্বটির মাত্রা সঙ্কোচ ঘটে। যেমন—

"শুধু বিঘে দুই। ছিল মোর ভুঁই। আর সবি গেছে।

ঋণে"—প্রত্যেক পর্ব ছয় মাত্রার অথচ শেষ পর্ব 'ঋণে' মাত্র দু মাত্রার। একে বলে "অপূর্ণ পর্ব"।

চরণ—

পূর্ণ যতির দ্বারা সীমিত কয়েকটি পর্বসমষ্টিই হল চরণ। এখানে ভাবের দিক থেকে ধ্বনির গতি পূর্ণ বিরতি লাভ করে।

। । ।। । । ।। । । । । ।।
পাখী সব | করে রব | রাতি পোহা | ইল ॥

এই একটি চরণ। পর্বগুলি চার মাত্রার, শেষেরটি দুই মাত্রার অপূর্ণপর্ব এক একটি চরণ সাধারণতঃ দুই, তিন, চার এমনকি পাঁচ পর্বের দ্বারা গঠিত হয়। এক একটি পর্বে আবার চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা দশ মাত্রা থাকে—

যথা—

দ্বি পার্বিক চরণ—(৮+৬) মাত্রা

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ॥

ত্রি পার্বিক চরণ (৮+৮+৬)

নদী তীরে বৃন্দাবনে | সনাতন এক মনে | জপিছেন নাম ॥

চতুঃ পার্বিক চরণ—(৬+৬+৬+৫)

চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে ॥

পঞ্চ পার্বিক চরণ—(৫+৫+৫+৫+২)

সকাল বেলায় | ভাতের থালা | সন্ধ্যা বেলা | রুটি কিম্বা | লুচি ॥

স্তবক—

দুই বা ততোধিক চরণ সুশৃঙ্খলভাবে একত্র সন্নিবেশিত হলে তাকে চরণগুচ্ছ বা স্তবক বলা যায়। আজকাল বাংলা কবিতায় বহু বিচিত্র ধরণের স্তবক বিন্যাস দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ—

মাত্রা গণনার বৈচিত্র্যের উপরই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য। আগেই বলেছি বাংলা অক্ষরের মাত্রা পরিবর্তনশীল, তাই মাত্রা গণনার পদ্ধতিটাও নানারকমের। এই থেকে নানা জাতের বাংলা ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে।

ছন্দ বিজ্ঞানীরা বাংলা কবিতার বিচিত্র ছন্দ সজ্জা পরীক্ষা করে উচ্চারণ ভঙ্গীর দিক থেকে তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

নিম্নলিখিত তিনটি ছত্র পরীক্ষা করে দেখা যাক—

(ক) আসিল যত | বীর বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি ॥
৬+৬+৬+৩

[দীর্ঘস্বর ও হসন্ত অক্ষর দু'মাত্রা, বাকি একমাত্রা]

(খ) আসিল বীরের দল | আসন ঘেরিয়া ॥ ৮+৬

[হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে প্রত্যেক অক্ষর একমাত্রা]

(গ) আস্‌ল যত | বীরের্ চমূ্ | আসন্ তোমার্ | ঘেরি ॥
৪+৪+৪+২

[হসন্ত অক্ষর একমাত্রা]

স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের উচ্চারণ পার্থক্য হেতু উপরোক্ত তিনটি ছত্রের পর্বের মাত্রা-সংখ্যা বদলে গিয়েছে অর্থাৎ ছন্দ সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের বদল ঘটেছে। সুতরাং ছন্দ বিচারে এই তিনটে ঢং তিনটি স্বতন্ত্র জাতের বলে মনে করা হয়েছে এবং উচ্চারণ ভঙ্গীর দিক দিয়ে এদের স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়েছে (১) ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (২) তান-প্রধান বা অক্ষর বৃত্ত ছন্দ (৩) শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলবৃত্ত ছন্দ। অবশ্য নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে যথেষ্ট তবু এই তিনটে নামই প্রচলিত বেশী। এইবার এক এক করে এই তিনটির মৌলিক লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করি—

ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত—

এ ছন্দের নানা নাম—ধ্বনিমাত্রিক, বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, পদ ছন্দ, তৎসম ছন্দ, ইত্যাদি—

এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে

(i) বর্ণের ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ যথাসম্ভব সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী এবং সেই অনুযায়ী মাত্রা গণনা, ক—ছত্রের মাত্রা গণনা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। এইজন্য এই ছন্দের নাম ধ্বনি মাত্রিক।

(ii) পর্বগুলিতে চার, পাঁচ, ছয়, সাত অথবা আট মাত্রা থাকে।

(iii) এই ছন্দে লয় দ্রুতও নয় আবার ঢিমাও নয়, মধ্যম রকমের গতিতে পর্বগুলি উচ্চারিত হয়। এইজন্য এই ছন্দের নাম মধ্যলয়ের ছন্দ।

(iv) সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর প্রত্যেকটি অক্ষরের ধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে মাত্রা নির্নীত হয়। আগেই বলেছি স্বরবর্ণের মাত্রা সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী। হসন্ত অক্ষরের ও যৌগিক অক্ষরের স্বর ধরতে হবে দু'মাত্রা, অনুস্বর বিসর্গের আগের স্বরবর্ণও দীর্ঘ হবে। বাকী সব একমাত্রার। যথা—

(১) নন্দপুর | চন্দ্রবিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার ৫+৫+৫+৫

চলে না চল | মলয়ানিল | বহিয়া ফুল | গন্ধভার ৫+৫+৩+৫

(২) কণ্টক গাড়ি ক | মল সম পদতল ৮+৮+৮+৩

মঞ্জির চীরহি | ঝাঁপি

(৩) পঞ্চশরে | দগ্ধকরে | করছে একি | সন্ন্যাসী ৫+৫+৫+৫

এই ছন্দে, সাধারণতঃ সংস্কৃত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়। তাই এর এক নাম তৎসম ছন্দ। সুতরাং সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের অনুকরণে বাংলায় যে সব ছন্দ তৈরী হয়েছে তাও সব এই ছন্দের অন্তর্ভূক্ত।—কয়েকটি দৃষ্টান্ত দি।

ছন্দ—

ভূজঙ্গ প্রয়াত—প্রতি চরণে ১২ অক্ষর—বিন্যাস লঘু + গুরু + গুরু

। ‖ ‖। ‖ ‖ । ‖ ‖ । ‖ ‖
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে—

। ‖ ‖ । ‖ ‖ । ‖ ‖
সতীদে সতীদে সতীদে—

তোটক—১২ অক্ষর - বিন্যাস লঘু + লঘু + গুরু

। । ‖ । । ‖ । । ‖ । । ‖
কত কাল পরে বল ভারতরে

। । ‖ । । ‖ । । ‖ । । ‖
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে

তূণক—১৫ অক্ষর—বিন্যাস গুরু + লঘু

‖ । ‖ । ‖ । ‖ । ‖ ‖ । ‖ । ‖
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে—

‖ । ‖ । ‖ । ‖ । ‖ । ‖ । ‖ । ‖
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে—

মন্দাক্রান্তা—১৭ অক্ষর-বিন্যাস গুরু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + লঘু + লঘু + লঘু + (লঘু + গুরু + গুরু) × ৩

‖ ‖। ‖ | । । । । । ‖ | ‖ । ‖ ‖ । ‖ ‖
পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল | কই গো কই মেঘ উদয় হও

এই ভাবে প্রাচীন বাংলায় বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে অনেক ছন্দ রচিত হয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও অনেক সংস্কৃত ছন্দের হিল্লোল বাংলায় আনতে

চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের রীতি বাংলায় মেনে চলতে হয়েছে তাই এ সবগুলি ধ্বনি প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

(২) তান-প্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

এ ছাড়া এটিকে পয়ার, ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দও বলা হয়। ছন্দের লক্ষণগুলি এর নাম থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রথমতঃ-এই ছন্দে অক্ষর-ধ্বনিতে একটা সুরের টান থাকে। টেনে তান রেখে পড়াই হল এই জাতীয় ছন্দের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ—এই ছন্দে যতি সাধারণতঃ বিজোড় মাত্রার পরে পড়েনা। ছয়, আট, দশ মাত্রার পর যতির অবস্থান। এইজন্য এই ছন্দের চাল একেবারে গজেন্দ্রগমন-বিনিন্দিত ধীর ও বিলম্বিত। তৃতীয়ত ঃ—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-ছন্দে এর প্রত্যেকটি অক্ষর, তা সে স্বর ব্যঞ্জন যুক্ত বা যৌগিক যাই হোক না কেন একমাত্রা বলে ধরা হয়।

অযুগ্ম অক্ষর ও যুগ্ম অক্ষর সবই হচ্ছে একমাত্রার। সুতরাং পর্ব ঠিক রেখে যুক্তাক্ষরহীন বর্ণকে সংযুক্তাক্ষরে পরিণত করলেও ছন্দের কোন ক্ষতি হয় না। টেনে টেনে তান দিয়ে পড়ার জন্যে অক্ষরের মধ্যে যে ফাঁক গড়ে ওঠে সংযুক্ত অক্ষর যেন সেই ফাঁকগুলোই ভরাট করে দেয়। মাটি যেমন জল শুষে নেয়, চোদ্দ অক্ষরী পয়ারও তেমনি সংযুক্ত অক্ষর শুষে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের এই গুণের নাম দিয়েছেন **শোষণ শক্তি**।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পয়ারের একটা ছত্রকে ক্রমশ ওজন বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন কতটা সে শোষণ করতে পারে।

(ক) পাষাণ মিলায়ে যায় | গায়ের বাতাসে
(খ) পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় | অঙ্গের বাতাসে
(গ) পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় | অঙ্গের উচ্ছ্বাসে
(ঘ) সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উচ্ছ্বাস
(ঙ) দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

ওজন বেড়েছে কিন্তু পয়ারের চাল পালটায়নি।

পয়ার ছন্দের বিভিন্ন রূপ

লঘুপয়ার—একপদী পয়ার—পর্বমাত্রা ৬+৫=১১ অক্ষর

বহুদিন পরে | বঁধুয়া এলে ॥
দেখা না হইত | পরাণ গেলে ॥

দ্বিপদী পয়ার বা প্রচলিত পয়ার ৮+৬=১৪ অক্ষর

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান ॥

তরল পয়ার—প্রচলিত লঘু পয়ারের ৪ ও ৮ মাত্রায় মিল

দেখ দ্বিজ ঃ মনসিজ ঃ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র ঃ যুগ্মনেত্র ঃ পরশয়ে শ্রুতি ॥

মালঝাঁপ পয়ার—উক্ত পয়ায়েই ৪, ৮ ও ১২ মাত্রার মিল

কোতোয়াল ঃ যেন কাল ঃ খাঁড়া ঢাল ঃ ঝাঁকে।
ধরি বাণ ঃ খর শাণ ঃ হান হান ঃ হাঁকে ॥

দীর্ঘ পয়ার বা মহা পয়ার—৮ + ১০ = ১৮ অক্ষর

অন্ন চাই প্রাণ চাই | আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু।
চাই বল চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু ॥

লঘু ত্রিপদী—প্রতি চরণে তিনটি পর্ব এবং ১ম ও ২য় পর্বান্তের মিল দেখানর জন্য চরণটিকে সাধারণতঃ ভেঙ্গে দুই পংক্তিতে সাজান হয়। ৬ + ৬ + ৮ = ২০ অক্ষর

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠকরে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী বা লাচাড়ী—৮ + ৮ + ১০ = ২৬ অক্ষর

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ।

লঘু চৌপদী— ৬ + ৬ + ৬ + ৫ = ২৩ অক্ষর

চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।

দীর্ঘ চৌপদী— ৮ + ৮ + ৮ + ৬ = ৩০ অক্ষর

অম্বরে অরুণোদয়। তলে দুলে দুলে বয় | তমসা তটিনী রাণী |
কুলু কুলু স্বনে

নিরখি লোচন লোভা | পুলিন বিপিন শোভা | ভ্রমেন বাল্মিকী মুনি | ভাবভোলা মনে।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর—

দুটো চরণের শেষে অক্ষরের মিল থাকলে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস থাকলে তাকে বলা হয় মিত্রাক্ষর। এতক্ষণ যতগুলি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হল তা সবই মিত্রাক্ষর। মিত্রাক্ষরের কবিতায় ছেদ আর যতি সাধারণতঃ একই স্থানে পড়ে। তার ফলে বাংলা ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়ে। চোদ্দ অক্ষরী পয়ারে আট ছয় মাত্রায় ওঠাপড়াটা এতবেশী গতানুগতিক যে তাতে চিত্তে কোন সাড়া জাগায় না।

মাইকেল মধুসূদন পয়ারের এই গতানুগতিক আর একঘেয়েমি ভাঙ্গবার জন্য চোদ্দ অক্ষরের পর্ব বিভাগটা এমন উল্টেপাল্টে দিলেন যার ফলে ছেদ আর যতি ভিন্ন স্থানে বসল। ছেদ আর যতি আলাদা হয়ে যাওয়ায় পয়ারের একঘেয়েমি ত গেলই, উপরন্তু প্রবাহমানতাও বাড়ল।

এই ছন্দের তিনি নাম দিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর, কারণ চরণান্তিক মিল তিনি রাখেন নি। পংক্তির শেষে মিলহীনতাটা অবশ্য এই ছন্দের প্রধানকথা নয়, প্রধানকথা হচ্ছে ছেদের আর যতির বিভিন্নতা।

সম্মুখ সমরে ❋ পড়ি। বীর চূড়ামণি।
বীরবাহু ❋ চলি যবে। গেলা যমপুরে।
অকালে ❋ ❋ কহ ❋ হে দেবি। অমৃত ভাষিণী। ❋

কোন বীর বরে ❋ বরি। সেনাপতি পদে। ❋
পাঠাইলা রণে ❋ পুণঃ। রক্ষ কুলনিধি।
রাঘবারি ? ❋ ❋

[। চিহ্ন দিয়ে পর্ব বিভাগ ও ❋ চিহ্ন দিয়ে ছেদ বা অর্থ বিভাগ দেখান হল]

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় চোদ্দ অক্ষরের পয়ারের ৮+৬ পর্বভাগটা অমিত্রাক্ষেরও অব্যাহত আছে। তবে ছেদ যতিকে অনুসরণ করেনি। ছন্দযতি পয়ারের ৮+৬ মাত্রার পর্বভাগ মেনে চলেছে, অথচ ভাবযতি বা ছেদ চলেছে স্বতন্ত্র ভাবে, ভাবের প্রবহমানতা অনুসরণ করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার ছন্দ থেকে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও পয়ারের আধারেই তা রচিত। পয়ারের উচ্চারণ ভঙ্গী ও পয়ারের লয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে অস্বীকার করা হয়নি।

অমিত্রাক্ষরে অন্তানুপ্রাস না থাকায় যেটুকু শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল, মাইকেল প্রচুর সংযুক্তধ্বনির সাহায্যে এবং অসংখ্য গম্ভীর তৎসম শব্দের ব্যবহারে তা রোধ করেছেন। পয়ারের শোষণ শক্তিকে মধুসূদন সার্থক ভাবেই কাজে লাগিয়াছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দুটো প্রধান লক্ষণ—চরণান্তিক মিলহীনতা এবং ছেদ ও যতির অমিত্রতা। মাইকেলের পরে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিবৃন্দ ওই নূতন ছন্দে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর রচনায় হেমচন্দ্রের

আদর্শ ছিল সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃত শ্লোকে পদান্তিক মিল থাকে না এবং চারি পাদে স্তবক হয়। এই আদর্শে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়ে হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষরের প্রাণধর্মের পরিচয় পাননি, তাই তিনি ছন্দে প্রবহমানতা আনতে পারেননি—অমিত্রাক্ষর তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে অমিল পয়ার মাত্র। যথা—

কহিলা এতেক সূর্য। ঝটিকার বেগে
চারিদিক হতে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

(বৃত্রসংহার)

নবীনচন্দ্রে কোমলমধুর লিরিক-উচ্ছ্বাস মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য ও তেজস্বিতা বজায় রাখতে পারেনি। তিনিও ছেদ ও যতির অমিত্রতার গুরুত্ব তেমন অনুধাবন করতে পারেননি, তাই মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের সার্থক অনুবর্তন তাঁর দ্বারাও সম্ভব হয়নি। যথা—

সায়াহ্নে আবার বন হইত পুরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শ্যামলী, ধবলী, লালী ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ ; আসিত ছুটিয়া—

(রৈবতক)

এর পরে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতে হয়। পূর্ববর্তী কবিবৃন্দ যেমন ছেদ যতির অমিত্রতাকে গৌণ করে চরণান্তিক

মিলহীনতাই মুখ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার বিপরীত। অর্থাৎ ছেদযতির অমিত্রমূলক ছন্দে চরণান্তিক মিল যোজনা করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নূতন সৌন্দর্য যোজনা করেছিলেন—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে।
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই!

মাইকেলের মত তিনি কখনও বিজোড় মাত্রার শব্দের পরে ছেদ স্থাপন করেন নি। তাঁর চরণগুলিও ১৪ মাত্রা, যতি আটে আর ছয়ে।

গৈরিশ ও মুক্তক ছন্দ—

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙ্গেই গৈরিশ আর মুক্তক ছন্দ তৈরী হয়েছে। মাইকেল ছেদকে যতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও পংক্তি গঠনটা চোদ্দ অক্ষরী পয়ারের ঢঙ্গেই রেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের সংলাপের জন্য প্রবাহমানতার দিকেই ঝোঁক দিলেন বেশী এবং সেই হিসাবে ছেদ অনুসারে পংক্তি বিন্যাস করতে গিয়ে একটি নূতন ছন্দের রূপ দিলেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে গৈরিশ ছন্দ। যথা—

নীর হেরি | নারী চক্ষে | দয়া না করিব,
প্রবীরে বধিব।

শুনি মম | নাম গান
সদয় হৃদয়—
পার্থ নাহি | প্রবীরে নাশিবে।

অবশ্য গিরিশচন্দ্রের পূর্ব থেকে এ জাতীয় ছন্দের প্রচলন বাংলায় ছিল। গিরিশচন্দ্রই এর ব্যাপক প্রচলন করেন।

এর থেকে মুক্তক ছন্দ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে মাত্র। মুক্তকছন্দে যতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত—ছেদ অনুসারেই পর্ব গঠিত আর পর্ব বিন্যাস অনুসারেই ছন্দের গঠন। যতির বন্ধন থেকে এ ছন্দ সম্পূর্ণ মুক্ত বলেই এর নাম মুক্তক ছন্দ। এই ছন্দে পর্ব দৈর্ঘ্য একান্ত অনিয়মিত—দুই থেকে দশমাত্রার পর্ব সবই এই ছন্দে দেখা যায় যায়—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা।
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা।
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক।
শুধু থাক।
এক বিন্দু নয়নের জল।
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।
এ তাজমহল।

(৩) শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলবৃত্ত ছন্দ

এছাড়া দ্রুতলয়ের ছন্দ স্বরবৃত্ত, লৌকিক ও ছড়ার ছন্দ নামেও একে বোঝান হয়।

এ প্রকার ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক পর্বের প্রথমে একটা প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তার ফলে ধাক্কা খাওয়া বর্ণের পরের বর্ণটি সঙ্কুচিত হয়ে যায়, ফলে উচ্চারণ হয় ক্ষিপ্র ও লঘু।

এখানে প্রত্যেক অক্ষর (হসন্ত) একমাত্রা ধরা হয় এবং পর্ব সাধারণতঃ হয় চারমাত্রার।

\+ ।। ।। | + । । ।। | + ।। ।। | + । ।
বিষ্টি পড়ে | টাপুর্ টুপুর | নদে এল | বান

\+ । । । । । | + । । ।। | + । । । । | +।।
খাঁচার ভিতর | অচিন্ পাখী | কম্‌নে আসে | যায়

মোটকথা সাধারণ ভাবে দেখলে তিনপ্রকার ছন্দে মাত্রা গণনার নিয়ম তিনরকম—তারি উপর পর্ব গঠন নির্ভর করে এবং তারি উপর নির্ভর করে ছন্দের নাম—

(১) মাত্রা প্রধান—হসন্ত অক্ষর দুমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুমাত্রা এবং স্বরান্ত অক্ষর একমাত্রা।

চন্দন = চন্ + দন্ = ২ + ২ = ৪ মাত্রা

(২) তান প্রধান—অক্ষর মাত্রেই একমাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ সংযুক্ত বিযুক্ত যাই হোক)

চন্দন = ১ + ১ + ১ = ৩ মাত্রা

(৩) বল প্রধান—হসন্ত অক্ষর একমাত্রা, হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরও একমাত্রা

চন্দন = চন্ + দন্ = ১ + ১ = ২ মাত্রা

কোন কবিতার ছন্দলিপি লিখতে হলে ছন্দ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ভাবে তার পরিচয় পত্রটি রচনা করতে হয়—

(১) ছন্দের রীতি অর্থাৎ ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, না বলপ্রধান

(২) পর্বসংখ্যা—চরণের পর্বভাগের সংখ্যা

(৩) চরণ—কয় পর্বে চরণ

(৪) স্তবক—স্তবকের চরণ সংখ্যা

(৫) লয়—ঢিমা মধ্য না দ্রুত লয়ের ছন্দ

দৃষ্টান্ত—

(১) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে
বাবু কহিলেন | বুঝেছ উপেন | এ জমি লইব | কিনে

ইত্যাদি

রীতি—ধ্বনি প্রধান

পর্ব—মাত্রিক পর্ব

চরণ—চতুঃপর্বিক (শেষ পর্ব অপূর্ণ)

স্তবক—১২টি মিতাক্ষর চরণযুক্ত

লয়—মধ্যলয়ের ছন্দ

(২) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে
বন্দী হতেম | না জানি কোন্ | মালবিকার | জালে

রীতি—শ্বাসাঘাত-প্রধান (অনেক সময় এই ধরণের ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে মনে হতে পারে কিন্তু মাত্রাবৃত্তের মত করে পড়লে বিভিন্ন পর্বের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে)

পর্ব—চার মাত্রার পর্ব

চরণ—চার পর্বের চরণ (শেষ পর্ব অপূর্ণ)

স্তবক—দুই মিতাক্ষর চরণ, লয়—দ্রুতলয়ের ছন্দ

(গ) জন্ম বৃথা ! কর্ম বৃথা ! | বৃথা বংশ খ্যাতি ! |
কীর্তিমান জনকের | পুত্র হওয়া *বৃথা। |
স্বনামে যদি না ধন্য | হয় সর্বলোকে |
জীবনে জীবন অন্তে | চিরস্মরণীয় ! |

[* দ্রুত উচ্চারণে হওয়া শব্দটির "ও" বর্ণ প্রায় অনুচ্চারিত, তাই হওয়া দুই মাত্রার শব্দ]

রীতি—তান প্রধান বা পয়ার—১৪ মাত্রার চরণ

সংযুক্ত বিযুক্ত বর্ণ, হসন্ত স্বরান্ত অক্ষর কিংবা হ্রস্ব বা দীর্ঘস্বর সবই একমাত্রা

পর্ব—আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার দুইটি পর্ব

চরণ—দুইটি পর্বে চরণ (প্রথম পর্ব ৮ মাত্রা ও শেষ পর্ব ৬ মাত্রা)

স্তবক - চারিটি মিতাক্ষরের চরণযুক্ত
লয়—বিলম্বিত

অনুশীলনী

১। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর শব্দ কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৭]

২। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের ব্যবহার উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও— [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৯]

৩। তোমার জানা কবিতার চার পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিভিন্ন পর্বভাগ করিয়া দেখাও। যতি মাত্রা ও প্রবহমান পয়ার এই সকল সংজ্ঞার অর্থ বল— [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫০]

৪। স্বনিছে পবন .....শাখে পাখী [মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে] পর্বভাগ করিয়া দেখাও, ইহার যতি কোথায় পড়িয়াছে?

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫১]

৫। পয়ারের ভিত্তিতেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়াছিলেন—পয়ার ও অমিত্রাক্ষরের সম্পর্ক দেখাইয়া ইহা প্রতিপন্ন কর।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫২]

৬। মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরবর্তী ছন্দকুশলী কবিদের হাতে কিছুটা ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যো, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ অবলম্বনে তাহার পরিচয় দাও— [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৩]

৭। কবিতা পড়িতে ও পড়াইতে গিয়া পয়ার ও অমিত্রাক্ষর এই দুটি ছন্দের কোন দিক দিয়া সাদৃশ্য ও পার্থক্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ? [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৪]

৭। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির পর্বভাগ করিয়া দেখাও। ইহাতে কোথায় কোথায় যতি পড়িয়াছে—

জন্ম বৃথা কর্ম বৃথা.....চিরস্মরণীয়।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৬]

৯। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা সাহিত্যের পাঠ দিতে গিয়া ছন্দের সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকা অনেকে শিক্ষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি? ছন্দ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা ছাত্রেরও থাকা উচিত নহে কি?—

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৭]

১০। বিদ্যালয়ে পড়াইতে গেলে শিক্ষককে 'ছন্দ' সম্বন্ধে কিছু জানিতেই হইবে, এমন কি কথা? আলোচনা করুন।

[কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৯]

———

অলঙ্কার

মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে, এ কথা পূর্ব প্রসঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছি। সে ভাষা হল কাজের ভাষা, নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন সাধনের ভাষা কিন্তু শুধু প্রয়োজন সাধনেই ত মানুষের আশা মেটেনা। আগেই বলেছি; জল আনবার জন্য কাজের মানুষ ঘট তৈরী করেছে, শিল্পী মানুষ তার গায়ে নকসা এঁকেছে আনন্দ প্রকাশের জন্য। তেমনি কাজের মানুষের কাজের ভাষা শিল্পী মানুষের হাতে হয়ে দাঁড়িয়েছে—আনন্দ প্রকাশের ভাষা সাহিত্যের ভাষা। জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির যে ভাষা সে ভাষা হল সোজাসুজি কাটা-ছাঁটা অর্থঅভিধা দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘেরা, কিন্তু মানবমনের অসংখ্য সূক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপ দেবার জন্য আমরা ত সেই ভাষারই সাহায্য নিই। তবে তার প্রয়োগ কৌশলের মাহাত্ম্যে নিত্যব্যবহারের জীর্ণ বাক্য মানুষকে ভাষার অতীত তীরে রসের রাজ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

অলঙ্কার কি?

রবীন্দ্রনাথের কামনা—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে ছন্দ মোরে দিবে নবসুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে—

এই নূতন সুর যোজনা কার্যের প্রধান সহায়ক অলঙ্কার। প্রচলিত অর্থে অলঙ্কার হল অঙ্গ প্রসাধনের ভূষণ। যথাস্থানে যথোপযুক্ত ভাবে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হলে দেহের যেমন শোভা সৌষ্ঠব বৃদ্ধি তেমনি কাব্যালঙ্কারও কাব্যদেহের শোভাবৃদ্ধির সহায়ক। বামনাদি কোন কোন ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ত মনে করতেন অলঙ্কারই হচ্ছে কাব্যদেহের প্রাণ।

পরবর্তী মতে রসই হচ্ছে কাব্য দেহের প্রাণ এবং অলঙ্কার হচ্ছে সেই রসলোকে পৌঁছুবার একটি প্রধান সোপান। নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যেমন বিচিত্র ধরণের অলঙ্কার প্রয়োজন, কাব্যদেহের সৌন্দর্য সাধনের জন্যও তেমনি নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন কবিবৃন্দ। অবশ্য দৈহিক অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যালঙ্কারের তুলনা করা হল বটে কিন্তু এ' দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। মনুষ্যদেহের অলঙ্কার হল একান্তই বাইরের জিনিষ, স্বর্ণকারের দোকান থেকে তা সংগ্রহ করতে হয় কিন্তু কাব্যদেহের অলঙ্কার কাব্যের সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত; কবির অন্তর থেকে কাব্যের বিষয়বস্তু ও তার অলঙ্কার একই সঙ্গে 'অপৃথগযত্ননির্বৃত্য' আবির্ভূত হয়।

ভাবকে রসলোকে উন্নীত করতে হলে ভাষাকে অলঙ্কৃত করলে কাজের সুবিধা হয় একথা সত্য, কিন্তু অলঙ্কৃত করা না করা কবির স্বতন্ত্র ইচ্ছাপ্রযুক্ত নয়। সুরসিক কবির হৃদয় থেকে অলঙ্কার যদি স্বতোৎসারিত হয় তবেই তাতে রসধর্মীতা থাকে। সুতরাং রসসৃষ্টির মূলে অলঙ্কার একটি উপাদান মাত্র। বিষয়

বৈভব, প্রকাশশৈলী বা কাব্যরীতি, পদলালিত্য ছন্দমাধুর্য অলঙ্কার বৈচিত্র্য সব মিলিয়েই কাব্যকে রসান্বিত করে। এই হিসাবে কাব্যের পক্ষে অলঙ্কার যে একান্তই অপরিহার্য একথা বলা চলে না—নিরাভরণ দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য যেমন চিত্তাকর্ষক নিরলঙ্কার কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

"একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা ॥"

প্রকৃতির একখানি যথাযথ চমৎকার বর্ণনা—কোন অলঙ্কারই এখানে প্রয়োগ করা হয়নি—তথাপি এই বর্ণনা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, রসসৃষ্টি করে। আলঙ্কারিকেরা অবশ্য একে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নাম দিয়েছেন। কিন্তু অলঙ্করণের শিল্প-কার্য এখানে কোথাও নাই—সেই হিসাবে স্বভাবোক্তিকে পুরোপুরি অলঙ্কার বলে অনেকে স্বীকার করেন না। যাই হোক একথা সত্য, যে কাব্য সৃষ্টির পক্ষে অলঙ্কার অপরিহার্য না হলেও সুপ্রযুক্ত অলঙ্কারের সার্থকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই।—

অলঙ্কারের শ্রেণীভাগ—

কাব্যের মূল হল কতকগুলো শব্দার্থময় বাক্য। অর্থাৎ শব্দ এবং তার অর্থ এই দুইএ মিলে তবেই হয় বাক্য এবং বাক্যই

হল কাব্যের একমাত্র উপাদান। তাহলে কাব্যকে অলঙ্কৃত করতে হলে শব্দ ও অর্থ বাক্যের এই দুটী অংশকেই অলঙ্কৃত করতে হয়। শব্দের অলঙ্করণ যেমন ধ্বনি সৌন্দর্যের প্রকাশক অর্থের অলঙ্করণ তেমনি ভাব সৌন্দর্যের উদ্‌ঘাটক। এই এই হিসাবে অলঙ্কার দুই শ্রেণীর—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার—শব্দগত সৌন্দর্য অর্থাৎ ধ্বনিসৌন্দর্যকে প্রকাশ করে এবং এর আবেদন প্রধানত—কানের কাছে। শব্দের ধ্বনি নিয়েই এই অলঙ্কারের যত খেলা, তাই অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দ বদল করলেই এই অলঙ্কার নষ্ট হয়ে যায়।—

যেমন—

শব্দালঙ্কার

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ—
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুল নারী

এখানে ঞ্জ ধ্বনিটি সাতবার উচ্চারিত হয়েছে—তাছাড়া ম. ক. ও গ ধ্বনি একাধিক বার উচ্চারিত হয়ে সুন্দর অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে—কিন্তু এই কবিতাটিই যদি একটু অদল বদল করে লেখা যায়—

ফুল্ল বিকচ কুসুম রাশী মধুপ শব্দ নিন্দি হাসি
হস্তির গতি তুল্য গমন সুন্দরী কুল নারী—

তাহলে এর ধ্বনি-গত সৌন্দর্যের অনেকখানি হানি ঘটে, যদিও অর্থের দিক দিয়ে বিশেষ তফাৎ হয়নি। এই শব্দলঙ্কার হল ছয় রকমের—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি আর পুনরুক্তবদাভাস—

এই প্রত্যেকটি অলঙ্কারের আবার নানা রকম প্রকার ভেদ আছে। দৃষ্টান্তসহ প্রত্যেকটির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অলঙ্কারের স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে সেগুলি দেখে নেবেন।

অর্থালঙ্কার হল অর্থের সৌন্দর্য-উদ্ঘাটক। অর্থাৎ যে অলঙ্কারের দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় তাই হল অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কারের আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধি দ্বারা অর্থ বুঝে তবেই এই অলঙ্কারের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আর এক কথা, সৌন্দর্য এখানে শব্দগত নয়, অর্থগত, তাই এই অলঙ্কারে অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রাননা না বলে শশীমুখী বলাও চলতে পারে—অলঙ্কারের পার্থক্য হবে না।

শব্দালঙ্কারের মত অর্থালঙ্কারও অনেক প্রকারের। তবে তাদের সাধারণ লক্ষণ দেখে শ্রেণীকরণ করলে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—সাদৃশ্য মূল, বিরোধ মূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল ও গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূল।

কোন কবিতার অলঙ্কার নির্ণয় করতে হলে আগে সেটি কোন শ্রেণীভুক্ত ঠিক করে নিলে সুবিধা হয়। শ্রেণীগত লক্ষণগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হলে অলঙ্কার নির্ণয় অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে।

প্রথমেই বলি "সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কার।" এরমূল কথা দুইটি বিসদৃশ্য বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা, ভিন্ন বস্তুর

মধ্যে কোন একটা অভিন্ন গুণ বা সমধর্মিতার সন্ধান করা।

অর্থালঙ্কার

এই জাতীয় অলঙ্কার হচ্ছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, দীপক, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তুপমা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা—প্রভৃতি—

বলাই বাহুল্য, অর্থালঙ্কারের মধ্যে সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারেরই বহুল প্রয়োগ এবং সংখ্যার দিক দিয়েও এরা বেশী। এগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে সম্ভব না হলেও প্রধান কয়েকটি সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের স্বরূপ লক্ষণ সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

মনে করা যাক, আকাশের চাঁদ আর মানুষের মুখ। বলাই বাহুল্য এই দুটি একেবারেই ভিন্নজাতীয় বিসদৃশ পদার্থ কিন্তু কবি দার্শনিকেরা এদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য বা সমধর্মিতা অবিষ্কার করেছেন সে হল স্নিগ্ধ উজ্জ্বল্য বা শোভা এবং সুডৌল আকৃতি। এই সাদৃশ্য প্রকাশ করবার জন্য উপমা রূপকাদি বিভিন্ন সাদৃশ্যমুল অর্থালঙ্কার ব্যবহৃত হয়। নিম্নের তালিকা থেকে এদের বৈশিষ্ট্য সহজেই মনে রাখা সম্ভব হবে—

চাঁদের মত মুখ—উপমা। (ভিন্নজাতীয় পদার্থের সঙ্গে তুলনা)

মুখই চাঁদ—রূপক। (ভিন্নজাতীয় পদার্থের অভেদত্ব জ্ঞান)

মুখ যেন চাঁদ—উৎপ্রেক্ষা। (উপমেয়কে উপমান বোধ)

মুখের মত চাঁদ—প্রতীক। (উপমানকে উপমেয় বোধ)

চাঁদের চেয়েও মুখ সুন্দর—ব্যতিরেক। (উপমেয়-উৎকৃষ্টতর)

একি মুখ? না চাঁদ?—সন্দেহ। (উপমান উপমেয়তে সংসয়)

মুখ নয় চাঁদ—অপহ্নুতি। (উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানের প্রতিষ্ঠা)

এ মুখই চাঁদ নয়—নিশ্চয়। উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা)

বিরোধমূলক অলঙ্কার ঃ—এদের মধ্যে প্রধান হল বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসংগতি আর বিষম। শৃঙ্খলা মূল অলঙ্কার হল কারণমালা, একাবলী, এবং সার। ন্যায়মূল অলঙ্কার মাত্র দুটি অর্থান্তরন্যাস ও কাব্যলিঙ্গ। গূঢ়ার্থমূলের উল্লেখ যোগ্য হল ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা, সূক্ষ্ম, অর্থাপত্তি ও স্বভাবোক্তি।

এগুলির বিস্তৃত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

অনুশীলনী

(১) ভাষায় অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? বাংলা ভাষার প্রযুক্ত অলঙ্কার কয় প্রকার? অলঙ্কারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৬]

(২) ভাষায় অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় কেন? শব্দলঙ্কারের ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য কি? শব্দালঙ্কারের প্রকারের ভেদ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৮]

(৩) দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাস, যমক শ্লেষ ও বক্রোক্তি বুঝাইয়া দাও।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৪৯]

(৪) শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পড়াইতে গেলে অলঙ্কারের অর্থ কি করিয়া বুঝাইতে হয়? দুইটি শব্দালঙ্কার ও দুইটি অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫০]

(৫) অলঙ্কার কি কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য?

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫১]

(৬) "বিসদৃশ পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে পারেন একমাত্র কবি দার্শনিক ও অলঙ্কারিকের প্রতিভা"। অন্ততঃ তিন প্রকার অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগের সাহায্যে এই উক্তিটির সত্যতা প্রতিপন্ন কর—

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৩]

(৬) কাব্যে অলঙ্কারের উপযোগিতা কতখানি? প্রাচীন কবিরা রূপ বর্ণনায় ব্যবহার করিতেন এমন অন্ততঃ তিনটি অলঙ্কারের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা কর— [কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৪]

(৮) শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা যমক, শ্লেষ, উপমা ও রূপক বুঝাইয়া দাও।

[কঃ বিঃ—বি. টি.—১৯৫৫]

সমাপ্ত

পাঠটীকা—কি ও কেন ?

লেসন্ প্ল্যান বা পাঠটীকা বস্তুটি কি বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়—সমর- কুশলী সেনাপতির কাছে যেমন রণক্ষেত্রের নক্সা, পাকা বাস্তুকারের কাছে যেমন নির্মীয়মান গৃহের নক্সা, সার্থক শিক্ষকের কাছেও তেমনি প্রদেয় পাঠের নক্সা। মনের মধ্যে ভাবী কাজের একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে কাজ কখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সুতরাং কোন শ্রেণীতে কোন একটা পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক মনে মনে পাঠ-পরিচালনার যে পরিকল্পনাটি তৈরী করে নেবেন সেইটেই হ'ল তাঁর লেসন্ নোট বা পাঠটীকা। এটি ছাড়া উদ্দেশ্য-মূলকভাবে কোনদিকে তাঁর এগোনই সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য—

সৃষ্টিধর্মী কাজ মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে—সুতরাং শ্রেণীতে আমরা যখন পাঠদান করতে যাব তখন মনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই থাকবে। এবং সেই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'উদ্দেশ্য' কথাটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। সব পাঠদানের উদ্দেশ্যই ত বিদ্যাদান কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে তার মধ্যে তারতম্য আছে। বিষয়-ভেদে এবং শ্রেণীভেদে এই উদ্দেশ্যের ইতর-বিশেষ ঘটবে না কি? সকল পঠিতব্য বিষয় গুলিকেই আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি জ্ঞানমূলক—তত্ত্ব ও তথ্য এই হ'ল এর মূলকথা। কিন্তু সাহিত্য? সেখানে ত রসানুভূতি-টাই চরম কথা। সুতরাং সাহিত্যের পাঠদানের প্রসঙ্গে যদি আমরা রসানুভূতিরই প্রাধান্য দিই তাহলে এমনভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে যাতে ব্যাকরণের কচকচি এসে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত না ঘটায়। ব্যাকরণ শেখানর জন্য স্বতন্ত্র পাঠ দেব কিন্তু কাব্য পাঠের রসাভাস ঘটাতে অবশ্যই দেব না।

এইভাবে পাঠটীকায় পাঠদানের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে প্রথমেই।

এরপর কিছু পাঠদান-সহায়ক উপকরণের উল্লেখ করতে হয়।

উপকরণ—শিশুর মনকে পাঠের দিকে আকৃষ্ট করতে হ'লে অথবা বিমূর্ত বিষয়গুলিকে মূর্ত করে তুলতে হ'লে অনেক সময় ছবি, অনুকৃতি (model), নক্সা ইত্যাদি দেখাতে পারলে ভাল।

মনোবিদেরা বলেন, পাঠ কেবলমাত্র শ্রুতি-নির্ভর না ক'রে যত অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়-নির্ভর করা যায় ততই পাঠদান সার্থক হয়। সেই দিক থেকেও পাঠের প্রদীপন হিসাবে কিছু উপকরণ নিয়ে যেতে পারলে ভাল। কোন্ পাঠে কি কি উপকরণ লাগতে পারে শিক্ষক আগে থেকে স্থির ক'রে না রাখলে যথাসময়ে তা কি করে পাবেন ? অবশ্য এই উপকরণ বিষয়ভেদে ও শ্রেণীভেদে বদলাবে। উচ্চতর শ্রেণীতে উপকরণবাহুল্য না করলেও চলবে।

আয়োজন—

এর পর হচ্ছে পাঠটীকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—আয়োজন। এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গেলে শিশুমনস্তত্ত্বে হার্বার্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টা কথা বলা দরকার, কারণ হার্বার্টীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানের ত্রি-সোপানিক (পঞ্চ সোপানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) পাঠটীকার উদ্ভব ঘটেছে।

হার্বার্ট বলেন, আমাদের যখন কোন অভিজ্ঞতা ঘটে তখন তার একটা অস্পষ্ট ছাপ আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। হার্বার্ট এই অস্পষ্ট ছাপের নাম দিয়েছেন এন্‌গ্রাম্ (Engram)। শুধু তাই নয়, নানা প্রকারের এন্‌গ্রামগুলি পরস্পর জোড়া তাড়া লেগে নতুন নতুন ছবি আমাদের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে এবং এই নতুন ছবিগুলির নাম দিয়েছেন তিনি "এপারসেপটিভ্ মাস্" (Apperceptive Mass) অথবা "এন্‌গ্রাম কমপ্লেক্স্" Engram Complex)। বাংলায় এদের বলা হয় ভাবজট বা ছাপজট।

শিশুমনের এই 'ভাবজট-বৃত্তির' সহায়তায় শিশু পুরাতনের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে থাকবে—জানা থেকে অজানায় যাবে। অর্থাৎ শিশুকে

নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে হবে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। যা' ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব বস্তুর ছাপ বা ভাবজট আছে তারি মাধ্যমে, তারি সহায়তায় নতুন বস্তুর অবতারণা করতে হবে, তবেই শিশুমন তাকে গ্রহণ করবে, নচেৎ নয়।

সুতরাং নতুন কিছু বিষয় পাঠদান করতে গেলে প্রথমেই শিক্ষার্থীর মনের পুরাতন ভাবজটের (Engram Complex) সন্ধান নিতে হবে। কিন্তু কি করে তা করা যায় ?

নানাবিধ প্রশ্ন করে, নানাপ্রকার কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনার সাহায্যে ছাত্রের মনের সেই ভাবজটটি জাগ্রত করতে হবে, পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিধিটি জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে পঠনীয় বিষয়ের কোন অংশটুকু অথবা পাঠ্যের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত কোন্ বিষয়টুকু ছাত্রের পরিচিত।

মোটকথা—শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারার একটা সাধারণ অংশ নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে সর্বাগ্রে। তারপরে তাকেই ভিত্তি ক'রে চলবে নতুন পাঠদান প্রক্রিয়া।

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত—কত বিষয় ছাত্রেরা পড়ে। প্রত্যেকটি বিষয়ের আনুসঙ্গিক ভাবজট জাগ্রত করবার বা সাধারণ অংশ আবিষ্কার করবার কৌশলটির মধ্যে সার্থক শিক্ষকের কৃতিত্ব নিহিত। তাছাড়া কোন নতুন বিষয় পড়ান আরম্ভ করবার পূর্বে ছাত্রের মনে যদি সে বিষয়ে কৌতূহল জাগান না যায় তাহলে কোন শ্রমই কাজে লাগে না। লোহা না তাতালে কি তাতে নতুন ছাপ নেয় ? অ-ক্ষুধার উপর খেলে যেমন কোন বস্তুই গায়ে লাগে না, আগ্রহ না জাগিয়ে শেখালেও তেমনি তা মনে লাগে না। তাছাড়া বর্তমান পাঠদান পদ্ধতিতে ৪৫ মিঃ অন্তর যে ভাবে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে, তাতে নতুন-পড়া আরম্ভ করার পূর্বে এইভাবে প্রাথমিক প্রস্তুতিকরণ ত অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে' প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে ছাত্রের মনে যেন 'পরীক্ষা দিচ্চি' এমন মনোভাবের সৃষ্টি না হয়—তাহলে শিক্ষক ও ছাত্রের মনের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদানের গতিটা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে,—অথচ এইটেই হ'ল পাঠদানের প্রাণবস্তু।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করবেন—ছাত্রেরা কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত জানে না শিক্ষক আজ তাকে কোন দিকে নিয়ে চলেছেন। শিক্ষক নানাবিধ কৌতুককর প্রশ্ন

ক'রে ধীরে ধীরে ছাত্রের মনকে অদ্যকার পাঠাভিমুখে নিয়ে চলেছেন—অতি কৌশলে, অতি সন্তর্পণে।

পাঠঘোষণা—

অতঃপর ছাত্রের মনে যখন অদ্যকার পাঠ-বিষয়ে যথোচিত আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে তখনই শিক্ষক সকলের কাছে প্রকাশ্যভাবে পাঠঘোষণা করবেন, অর্থাৎ তিনি আজ কতটুকু কি পড়াবেন তা বলবেন। পাঠঘোষণার পর আরম্ভ হবে দ্বিতীয় সোপান বা অদ্যকার পাঠ উপস্থাপন। এখান থেকেই হ'ল পড়ান শুরু আর প্রথম সোপান হল তার ভূমিকা।

উপস্থাপন—

আগেই বলেছি পাঠ দুই জাতের—জ্ঞানমুখী আর ভাবমুখী। সুতরাং তাদের উপস্থাপনাও হবে দুই প্রণালীর। জ্ঞানমুখী পাঠের পাঠটীকায় উপস্থাপনা অংশ দু'টি ভাগে বিভক্ত—বিষয় ও পদ্ধতি। অর্থাৎ একভাগে বলা হবে কি বিষয় পড়াব এবং অপর ভাগে বলা হবে কি পদ্ধতিতে পড়াব। বিষয়বস্তু ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করার সময় সমগ্র পাঠ্য বিষয়টিকে এমন কয়েকটি খণ্ডে ভাগ ক'রে নিতে হবে যে ভাবের দিক থেকে সেগুলি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন খণ্ডগুলির মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধ থাকে। তারপর সেই বিষয়গুলির পাশে পাশে এমন কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করতে হবে যে, তার উত্তর দেবার প্রসঙ্গেই পাঠ্য বিষয়টি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। প্রশ্নের উত্তর কতটুকু ছাত্র বলবে আর কতটুকু শিক্ষক ব'লে দেবেন সেটা নির্ভর করবে ছাত্রের জ্ঞানের পরিধির উপরে এবং শিক্ষকের প্রশ্ন রচনার কৌশলের উপরে।

ভাবমুখী বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যাদি পাঠের সময় আর উপস্থাপনা অংশ বিভক্ত করার দরকার নেই। প্রাধান্য সেখানে বিষয়বস্তুর নয়, রসবস্তুর। তাই সেখানে আদর্শ পাঠের মূল্য অনেক বেশী। অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দ যতি তাল সহযোগে একটি ভাল কবিতার যদি রস-সঞ্চারী পাঠ দেওয়া যায় তা'হলে ছাত্রের মনে যতখানি গভীরভাবে রেখাপাত করবে, কবির সঙ্গে কাব্যপাঠকের মনের যে সাহিত্য বা সহযোগ সৃষ্টি করবে তা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই হওয়া সম্ভব নয়।

এই অংশে যে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে তাও কাব্যের মর্মোপলব্ধি, রস-

গ্রহণ ও শিল্প-নৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। প্রয়োজন-বোধে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশ উল্লেখ করাও চলতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্য পঠন পাঠনার মধ্যেও এই দুই জাতের পাঠই আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের কথাই ধরা যাক। ব্যাকরণ, অনুবাদ, প্রভৃতি বিষয়গুলিকে আমরা জ্ঞানমুখী পাঠের অন্তর্গত বলে ধরতে পারি আর সাহিত্য অর্থাৎ গদ্য পদ্য পাঠ সম্পূর্ণভাবেই ভাবমুখী। এর আবেদন মস্তিষ্কের বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের অনুভূতির কাছে। জ্ঞানদান এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হল আনন্দদান সুতরাং এর পাঠদান-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা নয়, রসগ্রহণে সাহায্য করা, কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাহিত্য অর্থাৎ সহযোগ স্থাপন করা। পাঠটীকা প্রস্তুত করবার সময়ে এই মূল উদ্দেশ্যটি সব সময়ে মনের মধ্যে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে হবে। পাঠদানের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে এই কথা ইতিপূর্বেই বলেছি।

এই উদ্দেশ্যই রূপায়িত হবে উপস্থাপন পর্যায়ে। কি ভাবে এই কার্যটি সার্থক ভাবে করা যায় সেইটি এইবার আলোচনা করব।

প্রথমেই প্রদেয় পাঠ্যাংশটুকুর একটি রসগ্রাহী আদর্শ পাঠ দেবেন শিক্ষক। এখানে একটা প্রশ্ন হয় শিক্ষক কতটুকু পড়বেন, অন্তকার পাঠ্যাংশটুকু, না পুরা রচনাটি ? কেউ কেউ বলেন পুরা রচনা থেকে সামান্য একটু অংশ মাত্র পাঠ করলে রস নির্মিতি হবে কেমন করে ? ছাত্রের মনে একটা অতৃপ্তিকর কৌতূহল থেকে যাবে, যার ফলে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। কথাটা সত্য কিন্তু সুদীর্ঘ কবিতা, বিশেষতঃ দীর্ঘ গদ্য প্রবন্ধ একটানা পড়ে যাবার সময় কোথায় ? তাতে শুধু পাঠই হবে, সম্যক পঠনের সুযোগ থাকবে না, এবং দীর্ঘতার দরুণ অনেক সময় পাঠ ক্লান্তিকরও হতে পারে। সুতরাং মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। ছোট খাট কবিতা হলে প্রথম পাঠে সমগ্র কবিতাটি পড়ে দেওয়াই ভাল, যদিও সেটিকে ২।৩ দিনের পাঠের বিষয়ীভূত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ কবিতা বা প্রবন্ধ হলে তাকে ভাবের দিক থেকে কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে তার একটি খণ্ড পড়া যেতে পারে। যাই হোক সেটি সময় ও বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক ঠিক করে নেবেন।

আদর্শ পাঠের পরে সেই পাঠ ছাত্রেরা ঠিক মত শুনেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য এইবার শিক্ষক ২।৩টি স্থূল প্রশ্ন করবেন। এই প্রশ্ন কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক হবে না, পঠিত ঘটনামাত্র অবলম্বনে এই প্রশ্ন রচিত হবে—এই

জাতীয় প্রশ্নে অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী হতে সাহায্য করবে। এর পর হবে কাব্যের বা প্রবন্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তার জন্য শিক্ষক প্রদেয় পাঠ্যাংশটুকুকে আরো কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি খণ্ডের পূর্বরূপ আদর্শ পাঠ দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করবেন। এই সব প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষক পাঠের মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য কঠিন শব্দার্থ প্রভৃতি উপস্থাপন করতে পারেন। (দৃষ্টান্ত হিসাবে শেষে কয়েকটি পাঠটীকার নমুনা দেওয়া হল) শব্দার্থ জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। অযথা শব্দার্থ ও ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্নের বাহুল্যে যেন কবিতার রসমাধুর্য নষ্ট না হয়ে যায়। তাছাড়া শব্দার্থের জন্য শব্দগুলিকে বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করতে নেই। শব্দকে সব সময়ে বাক্যের পটভূমিতে রেখে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে হয়। "তবে মিছে সহকার শাখা তবে মিছে মঙ্গল কলস—"পড়াতে গিয়ে সহকার শব্দের মানে কি'—এই ভাবে প্রশ্ন করা অপেক্ষা 'মিছে সহকার শাখা'—বলতে কবি এখানে কি বুঝিয়েছেন ?—এই প্রশ্ন করা ভাল। শব্দ কখনই আমাদের সামনে বিছিন্ন ভাবে আসেনা—বাক্যের মাধ্যমেই আসে। কিন্তু অর্থবোধের সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে না বুঝে মুখস্থ করাই (cramming) উৎসাহিত হয়।

এই ভাবে পাঠ্যাংশটির সমুদয় অর্থ তাৎপর্য এবং মর্ম সম্বন্ধে ছাত্রের ধারণা স্পষ্ট হলে পর তাদের পড়তে দিতে হয়।

কেউ কেউ বলেন ছাত্রের পাঠ শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পরেই হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষকের পাঠ কৌশল শুনবার অব্যবহিত পরে পড়লে ছাত্র শিক্ষকের পাঠকে ভাল ভাবে অনুসরণ করতে পারবে। কিন্তু এই মত মনস্তত্ত্ব সম্মত বলে মনে হয়না। শিক্ষক প্রথমে আদর্শ পাঠের দ্বারা সাহিত্যের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন মাত্র। তখনও তার মধ্যে অনেক অজানা শব্দ অজানা ভাব অজ্ঞাত বাকভণিতি থেকে গিয়েছে, বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ ছবিটি তখনও ছাত্রের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থায় পাঠের মধ্যে কখনই স্বতঃস্ফূর্ত রস সঞ্চার হতে পারেনা, ছন্দ যতি তালের স্বাভাবিক বিন্যাসও তখন আমরা কখনই আশা করতে পারিনা ছাত্রের কাছ থেকে। এই অবস্থায় ছাত্রের পাঠ হবে একান্ত অনুকরণ-নির্ভর। অভিনয়ে স্মারকের (prompter) কথার উপর মাত্র নির্ভর করে পার্ট বলে গেলে সে পার্ট যেমন প্রাণহীন কৃত্রিম হয়, শিক্ষকের আদর্শ পাঠ নকল করে পাঠ করলেও হয় তেমনি প্রাণহীন কৃত্রিম। কিন্তু

বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্রটি মনের মধ্যে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন সেই পাঠ হবে স্বাভাবিক, স্বতোৎসরিত। শিক্ষক ত ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার পাঠ দিলেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ত আদর্শ পাঠ চলছেই এবং ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ পাঠের স্বরবৈচিত্র্য ও ছন্দযতির বিন্যাস ছাত্রের মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই স্তরেই ছাত্রের পাঠ যে সমধিক কার্যকরী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ছাত্রের পাঠের পরে এবং অভিযোজনের পূর্বে শিক্ষক পাঠ্যাংশটির আর একটি আদর্শ পাঠ দিলে ভাল হয়। গদ্য পাঠের বেলায় এটা হয়ত সম্ভব হবে না তবে কবিতা পাঠের বেলায় অবশ্যকরনীয়। এর কারণ আছে—

আগেই বলেছি, সাহিত্য পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্যে হল রসসৃষ্টি এবং ছাত্রদের সেই কাব্যামৃত রসাস্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করতে গিয়ে কাব্যের অর্থ ব্যাখ্যা তাৎপর্য নিয়ে এমন অনেক আলোচনা এতক্ষণ ধরে করতে হয়েছে যার ফলে কাব্যের সেই রসমূর্তি অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে—রসাস্বাদন অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। সুতরাং কবিতাটির পুনরায় আদর্শ পাঠ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে রসপরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কবিই হলেন কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—কাব্যের মাধ্যমে কবি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন কোন টীকাকারই তা পারবেন না, তাই কাব্যের আদর্শ পাঠ এত প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষক একাধিকবার কবিতাটির রসগ্রাহী পাঠ দিতে পারেন—তবে বারংবার মামুলি পাঠের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে যেন একঘেয়েমির সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বোর্ডের কাজ—

পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে চলবে বোর্ডের কাজ। ছাত্রদের কাছ থেকে নিষ্কাশিত উত্তরগুলি শিক্ষক আরো মার্জিত এবং সংক্ষিপ্ত করে বোর্ডে লিখে দেবেন অর্থাৎ ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষক সেই দিনকার পাঠের সংক্ষিপ্ত সারটি বোর্ডে লিখে দেবেন পাঠের গতি অনুসরণ ক'রে। সাহিত্যপাঠে বোর্ডের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু তুলনীয় কবিতা লিখে দেওয়া যেতে পারে। অথবা কিছু কিছু দুরূহ শব্দ থাকলে ছাত্রের সহযোগিতায় তার উত্তর লিখে দেওয়া ভাল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠের রসানুভূতির উদ্দেশ্যটি যেন শব্দার্থ ও ব্যাকরণের ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে না যায়।

দ্রুত পঠনের বেলায় গল্পের মূল বিষয়টি কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে প্রত্যেক খণ্ডের শিরোনামা লিখে দিতে হয়—তাতে ছাত্রের পক্ষে গল্পের কাহিনীকে অনুসরণ করা সহজ হয়।

রচনা লেখাতেও বিষয়বস্তুর কয়েকটি সঙ্কেত বোর্ডে লিখে দিলে রচনা লেখার পক্ষে সুবিধা হয়।

ব্যাকরণ শেখাতে বোর্ডের সাহায্য ত অপরিহার্য, অবরোহ পদ্ধতিতে সূত্র নিষ্কাষণ করতে হয়।

অভিযোজন

এইভাবে পাঠদান শেষ হয়ে গেলে আমরা পাঠটীকার তৃতীয় সোপান বা শেষ সোপানে উপনীত হলাম। এর নাম অভিযোজন (Application)—এই অংশে দেখতে হবে ছাত্র এতক্ষণ ধরে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ তার দ্বারা সম্ভব কিনা। যে অংশ তারা শিখল তারি সাহায্যে যে অংশ তখনও শেখেনি তাতে কিছু আলোকপাত করতে পারে কিনা।

প্রয়োগকৌশল না শিখলে জ্ঞানের ত কোন মূল্যই নেই। নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অর্জিত-জ্ঞানের যদি কোন সাহায্য আমরা না পাই, তবে সে জাতীয় জ্ঞানের মূল্য কী? সুতরাং এই অংশে এমন কতকগুলি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করতে হবে যার সাহায্যে ছাত্রের জ্ঞানের ও রসানুভূতির এই অভিযোজন ক্ষমতা যেন আমরা বুঝতে পারি।

বাড়ীর কাজ

পরিশেষে কিছু বাড়ীর কাজ উল্লেখ ক'রেই পাঠটীকার কাজ শেষ। বাড়ীর কাজ অবশ্য এমন কিছু হবে না যাতে ছাত্রের বিরক্তি উৎপাদন করে। বুদ্ধির পরিচয়, আগ্রহের পরিচয়, রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এমন কিছু সুনির্বাচিত হাল্কা কাজ দিতে হবে।

মোটকথা পাঠ-পরিকল্পনার প্রধান তিনটি অংশ—প্রথমে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে হবে, রসানুভূতির সঞ্চার করতে হবে অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আগ্রহান্বিত মনে নূতন পাঠের রস পরিবেশন করতে হবে অর্থাৎ কর্ষিত ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের বীজ বপন করতে হবে।

পরিশেষে তৃতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত রস চিত্ত কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে, নূতন জ্ঞানে হৃদয়ের ভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ উৎপন্ন ফসল কতটা গৃহজাত হ'ল তারও খবর নিতে হবে।

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'লে এই প্রণালীতে পাঠদানের কাজ যে অনেক বেশী ভালভাবে সার্থকভাবে এবং আনন্দিতভাবে নির্বাহ হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের স্থান—

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সেনাপতির কাছে সমরক্ষেত্রের নক্সার মতই শিক্ষকের কাছে পাঠটীকার মূল্য। উপমাটা আরো একটু ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাক। যুদ্ধের নক্সার সঙ্গে যদি পাঠটীকার তুলনা করতে হয় তাহলে সুসজ্জিত সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রশ্নাবলীর। সৈন্যেরা যেমন সুকৌশলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ জয় করে, পাঠও পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যায় প্রশ্নের সাহায্যে। সৈন্যের রণচাতুর্য ও বীরত্বের উপরে যেমন যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে, তেমনি ভালমন্দ প্রশ্ন নির্বাচনের উপরেই পাঠের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে।

সুতরাং পাঠটীকা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন নির্বাচন ও প্রশ্ন করবার কৌশল আলোচনা করা দরকার। কারণ ভাল প্রশ্ন করতে না জানলে কখনও ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না—(a bad questioner is a bad teacher—David Salmon).

প্রশ্ন করি কেন ?—

প্রথমেই দেখা দরকার প্রশ্ন করি কেন অর্থাৎ পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের স্থান কোথায় ? আমরা সাধারণতঃ প্রশ্ন ক'রে পড়া ধরি—পাঠ্যবস্তু কতখানি আত্মস্থ হয়েছে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে—কিন্তু প্রশ্নের উদ্দেশ্য তা মোটেই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন করবার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখতে পারি। যথা—

[১] ছাত্র কতটা শিখেছে তা তার নিজেরই বুঝবার জন্য।
[২] ছাত্র কতটা শিখেছে তা অপরকে দেখাবার জন্য।
[৩] ছাত্র শিক্ষককে কতটা অনুসরণ করতে পেরেছে তা বুঝবার জন্য।
[৪] ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে আরো উদ্বোধিত করার জন্য।
[৫] ইতিপূর্বে যা শেখা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির জন্য।
[৬] যতখানি পাঠদান করা হ'ল তার কতটা কাজে লাগল তা বুঝবার জন্য।
[৭] ছাত্রের মনে নূতন পাঠের প্রতি আগ্রহ জাগাবার জন্য।
[৮] ছাত্রের অমনোযোগ প্রতিরোধের জন্য।
এবং [৯] ছাত্রের আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিরোধের জন্য।

এই কারণগুলিকে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। ছাত্রের মনের অন্ধকারময় গোপন মণিকোঠার সন্ধান ত শিক্ষককে এই প্রশ্নের বাতি জেলেই নিতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য প্রশ্নও হবে বিভিন্ন ধরণের সুতরাং প্রয়োজনানুরূপ প্রশ্ন তৈরী করা একটা মস্তবড় জটিল সমস্যা ও সুনিপুণ শিল্পকার্য। প্রত্যেক শিল্পকার্যেরই যেমন একটা নিয়ম শৃঙ্খলা গড়ে উঠে, প্রশ্নগঠন কার্যেরও তেমনি গড়ে উঠেছে একটা বিধিনিয়ম। বহু শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ক'রেই এইসব বিধিনিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো রচিত হয়েছে। সুতরাং অনভিজ্ঞ নূতন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পক্ষে প্রশ্ন নির্মাণের এই নিয়মশৃঙ্খলার মূল সূত্রগুলি জানা একান্ত আবশ্যক।

পাঠটীকা যেমন তিনখণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডের প্রশ্নও হবে তেমনি তিনটি বিভিন্ন জাতের। ১ম—আগ্রহ উদ্দীপক প্রশ্ন (Thought provoking questions) ২য়—পাঠ পরিণতিমূলক প্রশ্ন। (Developing questions), ৩য়—পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing questions),

এরপর আলোচনা করি প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে—

(১) প্রশ্নের ভাষা সহজ সরল ও সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা গঠিত হওয়া চাই—বাক্য যত ছোট হয় ততই ভাল। একটা দৃষ্টান্ত দিই—"তোমাদের মধ্যে

কোন ছেলে যদি এই গ্রীষ্মের ছুটির শেষের দিকে এখান থেকে বহুদূরে এমন এক পল্লীগ্রামে যাও যেখানে সবুজ মাঠের ধারে ধারে কাদা আর তার নীচেই ঘোলা জলের ডোবা, আর সেখানে গিয়ে যদি তোমরা খেয়াল খুসি মত ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাক তাহলে একজাতীয় ছোট ছোট জীবকে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়তে দেখবে। বলত সেই জীবগুলি কি ?"—ব্যাঙের কথা বলতে গিয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলেই হয়েছে আর কি।

অথবা "প্রাবৃটকালে মার্তণ্ডের প্রচণ্ডতা থাকে না কেন ?"—বাক্য ছোট হ'লে কি হয়, শব্দের হুঙ্কারেই ছাত্রের দফা শেষ হবে। বলাই বাহুল্য এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অচল।

(২) প্রশ্নের ভাষা যতদূর সম্ভব পাঠ্য পুস্তকের ভাষাকে অনুসরণ না ক'রে চলাই উচিত। বইয়ের ভাষায় প্রশ্ন করলে উত্তর সাধারণতঃ বইয়ের ভাষাতেই দেবে ছেলেরা—তাতে তাদের চিন্তাশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। হুবহু বইয়ের কথা দিয়ে কখনও প্রশ্ন করতে নেই—যথা—"ইংলণ্ডে চা উৎপন্ন হয় না"—কেন হয় না ?—"তুন্দ্রাবাসী এস্কিমোরা যাযাবর"—কারা যাযাবর ?—এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষকেরও চিন্তাশীলতার কোন প্রমাণ নেই।

(৩) প্রশ্নের সময় ঠিক প্রশ্ন ছাড়া অযথা বাক্য-বিন্যাস করা উচিত নয়—" "আচ্ছা দেখি ত তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে—" অথবা "এই কথাটির জবাব যে দিতে পারবে, বুঝব সে ভাল পড়া করেছে"—এই জাতীয় প্রশ্নের ভূমিকায় ছাত্রের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে।

(৪) প্রশ্ন হবে সুস্পষ্ট এবং একটি মাত্র নির্দিষ্ট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রীভূত।—"পলাশীর যুদ্ধের পর কি ঘটেছিল ?" অথবা "নদীর জলে কি ভাসে ?" এই জাতীয় অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট প্রশ্নের একাধিক উত্তর হ'তে পারে। ছাত্র বুঝতে পারে না শিক্ষক ঠিক কোন জিনিষটি চান।

(৫) বিকল্প উত্তর হ'তে পারে এমন প্রশ্ন ভাল নয়—"বাদুড়ের ডিম হয় না বাচ্চা হয় ? পদ্মফুল দিনে ফোটে না রাত্রে ফোটে ?" এই জাতীয় প্রশ্নে দুটো মাত্র উত্তর হতে পারে—তার মধ্যে একটি ভুল অপরটি ঠিক। এ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অনেক সময়ে আন্দাজে উত্তর দিয়ে বাহাদুরী নেয়।

(৬) এমন কোন প্রশ্ন করা ঠিক নয়—যার উত্তর শুধুমাত্র হাঁ বা না দিয়েই দেওয়া যায়।

"তোমরা কেউ বাঘ দেখেছ ? নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয় বলতে পার ? তুমি কি ফুটবল খেলতে ভালবাস ?"—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ছেলের একটুও চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না। আন্দাজে একটা হাঁ বা না ব'লে দিলেই হ'ল।

(৭) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তর হবে সুদীর্ঘ অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতে হবে। যথা—"আকবরের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর" কিংবা আফ্রিকার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও"—এই বিষয়গুলিকে আরো ৫।৬টি এমন ছোট ছোট প্রশ্নে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে যার উত্তর ২।১টি কথায় দেওয়া যায়।

(৮) পড়াবার সময় যে কথাগুলি বলা হ'ল, পর মুহূর্তে সেই কথা ধরেই প্রশ্ন করা চলবে না। যেমন বলা হল "শেরসাহ প্রথম এদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। অমনি প্রশ্ন—কে ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন করেছিলেন ? ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন—ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কী ?" বলাই বাহুল্য এই জাতীয় প্রশ্নের কোন সার্থকতাই নেই।

(৯) শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্ন করা চলবে না, যেমন—আমেরিকা আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে ? উত্তর হ'ল—কলম্বস।

মাদ্রাজিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে—? উত্তর হল—ভাত।

এ ধরণের প্রশ্নে ছাত্রের চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না—যেটুকু জানে সেটুকুও গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা হয় না।

(১০) প্রশ্ন সব সময়েই পাঠ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই, নইলে ছাত্রের চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বর্ষার কবিতা পড়ান হবে, আয়োজনে বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল—তা থেকে অন্যান্য ঋতুর কথা—তা থেকে বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক বর্ণনা—এইভাবে অযথা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরে চলে গেলে পাঠ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে।

(১১) প্রশ্নের মধ্যে কিছু কিছু ভাষার বৈচিত্র্য আনা দরকার। অনেক সময় একটা প্রশ্নই ২।৩ বার করার দরকার হতে পারে—সে ক্ষেত্রে একই ভাষা ব্যবহার না ক'রে বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করেন—প্রশ্ন করা যায়—(i) ক্লাইভ সিরাজকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করেন ? (ii) ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে কাকে

পরাজিত করেন ? (iii) সিরাজকে কে পরাজিত করেন ? (iv) কার হাতে সিরাজের পরাজয় ঘটল ? এইভাবে একই প্রশ্ন নানাভাবে ঘুরিয়ে করা যায়। তাতে প্রশ্নের একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(১২) কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর একই ভাষায় ঐ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়—তাহ'লে ছেলেরা শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতি সব সময়ে সমান মনোযোগ দেবে না—কারণ তারা জানে যে শিক্ষক ওটি ২।৩ বার বলবেন।

(১৩) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই থেকে গিয়েছে যথা—চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত দেশের বন্ধু সেইজন্য দেশবাসী তাঁকে কি নাম দিয়েছিল ? —এ জাতীয় প্রশ্ন কোন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না।

(১৪) প্রশ্ন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—শিক্ষক প্রশ্নগুলি এমন মধুরভাবে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে করবেন যে ছাত্রদের উত্তর দেবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ জাগবে। আদালতে জেরা করার মত যেন একটা ভায়াবহ ব্যাপার পরিণত না হয় ক্লাশে।

এইবার প্রশ্নগুলি কিভাবে করা হবে সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করি—

(১) প্রশ্ন কখনই কোন ছাত্র বিশেষকে উল্লেখ ক'রে করা হবে না—প্রশ্ন করা হবে সমস্ত ক্লাশকে—সম্ভাব্য উত্তর সম্বন্ধে সকলেই ভাববে। তারপর যারা পারবে তাদের হাত তুলতে ব'লে তার মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসা করবেন।

(২) প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করবেন না—ভাববার জন্য একটু সময় দিতে হবে।

(৩) প্রশ্ন সব সময়ে হাত-তোলা ছেলেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবেন না, হাত-না-তোলার মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন।

(৪) প্রশ্ন কখনও পর পর ছেলেদের ধরে যাবেন না—সামনে পিছনে আশে পশে অর্থাৎ সারা ক্লাশে প্রশ্ন ছিটিয়ে দেবেন।

(৫) ক্লাশে পাঠ পরিচালনার সময় চেয়ারে বসে বা টেবিলে ঝুঁকে থাকবেন না—এক জায়গায় কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েও নয়, আবার সারা ঘর পায়চারি করেও বেড়াবেন না। মোটকথা বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলাফেরা করবেন। অনেকে পড়াতে পড়াতে বেঞ্চের পাশ দিয়ে ক্লাশের শেষ পর্যন্ত চলে যান। এটা কখনও উচিত নয়। ভেবে দেখবেন সমস্ত ছেলের

দৃষ্টি আপনার দিকে—আপনি যদি ক্লাশের পিছনে চলে যান তাহলে সব ছেলের চোখ ঘুরে যাবে পিছন দিকে···ক্লাসের মনোযোগ ব্যাহত হবে।

৬। অনেকে ক্লাশের দিকে পিছন ফিরে অনেকক্ষণ ধরে বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন—এটা ভাল নয়। প্রথমতঃ বোর্ডটা এমনভাবে বসাতে হবে—যাতে লিখবার সময় শিক্ষককে একেবারে পিছন ফিরতে না হয়। তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে কিছু লেখা ভাল নয়। অল্প অল্প ক'রে লিখতে হয়।

(৭) একসঙ্গে একাধিক ছেলের উত্তর দেওয়া চলবে না—শিক্ষক সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন।

(৮) ক্লাশে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে বোর্ডে আগের ঘণ্টার পাঠ্য বিষয় লেখা রয়েছে—পড়ান হচ্ছে বাংলা কবিতা, শিক্ষক নানাভাবে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, অথচ ছাত্রদের সম্মুখেই বোর্ডভরা এলজ্যাবরার অঙ্ক কষা। এটা খুব খারাপ। শিক্ষক ক্লাশে গিয়েই বোর্ড মুছে নেবেন এবং ক্লাশের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে আসবেন।

(৯) আগের দিন যদি কোন গৃহকাজ দেওয়া থাকে সেটি অবশ্য দেখতে ভুলবেন না—তা না হ'লে গৃহকাজের কোন গুরুত্ব থাকবে না। খাতা ক্লাশে দেখবেন না, অবসর সময়ে দেখে এনে মনিটার মারফত ফিরিয়ে দেবেন।

(১০) ছাত্রেরা কোন ভুল উত্তর দিলে অপর ছাত্রের দ্বারা তার সংশোধনের চেষ্টা করবেন, কেউ না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। অসংশোধিত ভুল উত্তর ফেলে রেখে কখনই দ্বিতীয় প্রশ্নে যাবেন না।

(১১) ভুল উত্তর যেমন না জানার জন্য হ'তে পারে আবার তেমনি—প্রশ্নটি ঠিকমত বুঝতে না পারার দরুণও হ'তে পারে। সুতরাং ভুলের কারণটি নির্ণয় ক'রে তবেই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) কোন ছাত্র কোন ভুল বা হাস্যকর উত্তর দিলে শিক্ষক কখনই হাসবেন না বা ক্লাশে এই নিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না। এই জাতীয় উত্তরের কারণটি অতি সহানুভূতির সঙ্গে নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন।

এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে করলেই চলবেনা পাঠকের দিকেও সমভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন ছাত্রের বুদ্ধি বিবেচনা ও মানসিক সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে করলে সমস্ত পাঠই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় একই কবিতা উচ্চশ্রেণীতেও পড়ান হচ্ছে, অবার

নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুই শ্রেণীতে পাঠ পরিচালনা নিশ্চয়ই একই ভাবে হবে না। ঐ কবিতাটির পাঠটীকা শ্রেণীকক্ষের বুদ্ধি-সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হবে, এ কথা ত বলাই বাহুল্য।

এইখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বক্তব্যবিষয়টি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের "দেবতা-বিদায়" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্দ্ধারিত সংকলিতা ১ম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার ঐ কবিতাটি নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেও দেখা যায়। কবিতাটির শেষ চারিটি ছত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করি—

ভক্ত বলে 'প্রভুমোরে কী ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।—
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

ষষ্ঠ শ্রেণীতে সোজাসুজি কাহিনী মূলক প্রশ্ন করা যেতে পারে যথা:—

(১) ভক্ত কি কহিলেন ?
(২) দেবতা উত্তরে কি বলিলেন ?
(৩) ভক্ত দেবতাকে 'কী ছল ছলিলে' বলিল কেন ?
(৪) দেবতা জগতে কি ভাবে বেড়ান ?
(৫) কি জন্য তিনি বেড়ান ?
(৬) কি করিলে তিনি ঘরে থাকেন ?
(৭) গৃহহীনকে কি দিতে হয় ? ইত্যাদি

উচ্চতর শ্রেণীতে কবিতাটির তাৎপর্য মূলক প্রশ্ন করিলে ভাল হয়। যথা—

(১) ভক্ত এখানে দেবতার কোন ছলনার কথা উল্লেখ করিতেছেন ?
(২) ভিখারী অকস্মাৎ দেবতার মূর্তি ধরিল বলার তাৎপর্য কী ?
(৩) "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"

বিবেকানন্দের এই কবিতাটির মর্মার্থ এই কবিতায় কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ?

(৪) ভগবান জগতে দরিদ্ররূপে কি ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ?
(৫) ভগবান মানুষের হৃদয়ে দয়া চান—বলিবার উদ্দেশ্য কি ?

(৬) গৃহহীনকে গৃহ দিলে তবেই ভগবান গৃহে থাকেন এই জাতীয় একটি তুলনীয় কবিতা বল—

[তুলনীয়—অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি..... তবে আজ কিসের উৎসব ? কাঙ্গালিনী রবীন্দ্রনাথ) ?

(৭) কোন সবল ভাই যদি অপর দুর্বল ভাইকে অযথা উৎপীড়ন করে তবে পিতা সেই উৎপীড়ক পুত্রকে কি ভাবে দেখেন ?

(৮) ভগবানকে যদি জগৎ পিতা বলা যায় তাহা হইলে মানুষে মানুষে কি সম্বন্ধ হয় ?

(৯) মানুষ যদি মানুষকে কষ্ট দিয়া ভগবানকে পূজা করিতে বসে তাহা হইলে ভগবান কি বলিবেন—

[তুলনীয়—তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ?]
নজরুল—

(১০) "দেবতা বিদায়" এই শিরোনামার অর্থ কি ?

(১১) প্রবীন ভক্ত নিশিদিন দেবতার নাম জপ করা সত্ত্বেও মন্দির হইতে দেবতা বিদায় লইতেছেন কেন ?

(১২) দেবতার নাম জপ না করিয়াও কি করিলে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় ?

(১৩) প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ কি ?

মোটামুটিভাবে এই হ'ল পাঠটীকা প্রণয়নের এবং তা পরিচালনার কৌশল—এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। আমার জনৈক শিক্ষকবন্ধু এই আলোচনাটি শুনে দুটি মন্তব্য করেছিলেন—মন্তব্য দুটি কেবলমাত্র সেই শিক্ষকবন্ধুরই নয়, অনেক পাঠকবন্ধুর মনেই জাগতে পারে—তাই সে বিষয়ে দু' একটি কথা বলা দরকার।

প্রথম কথা হ'ল—বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে শিক্ষকমশাইদের দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা ক্লাশ নিতে হয়, যেখানে ভাল মন্দ মাঝারি ৫০।৬০ জন ছেলে এক এক শ্রেণীতে ঠাসাঠাসি ক'রে বসে আছে, যেখানে বিদ্যালয়ে এক চক ডাষ্টার ছাড়া আর কোন উপকরণই পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে বোর্ড নির্দিষ্ট বিরাট পাঠ্যতালিকা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ ক'রে দেবার দায়িত্ব বহন করতে হয়, যেখানে পরীক্ষা প্রথায় না বুঝে মুখস্থ করার কৌশলটি যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত—সেখানে

এই হার্বার্টিয় মনস্তাত্ত্বিক পাঠদান কৌশলের স্থান কোথায়, সুযোগ কোথায় এবং সার্থকতাই বা কতটুকু ?

প্রশ্নটি একান্তই প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নাই। শিক্ষাকে সুন্দর এবং সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে শিক্ষালয়ের ঘরবাড়ী, ছাত্র, শিক্ষক, পাঠ্যতালিকা, পরীক্ষা প্রণালী সব কিছুরই আদ্যন্ত সংস্কার করা প্রয়োজন। শুধু পাঠদান প্রণালীটি সংস্কার করলেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর একটা মূল্য আছে। প্রথমতঃ আমাদের আলোচনা হ'ল আদর্শ নিয়ে—আজকের দিনে অবশ্য বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের ব্যবধানটা আসমান জমিন্।

কিন্তু আদর্শের পূর্ণচিত্রটি মনের মধ্যে না থাকলে ত কোনদিনই এই দুস্তর ব্যবধান ঘোচান সম্ভব হবে না। সংস্কারের যে অংশটুকু সরকারের হাতে ...র হাতে সেটুকুর কথা ছেড়ে দিয়েও মাষ্টারমশাইদের হাতে (অবশ্য ...ক্ষকমশাইকে ধরে) যতটুকু আছে সেটুকুর আদর্শানুগ ব্যবস্থা ...ল যে অনেকখানি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ...কার খুঁটিনাটি কথা ছেড়ে দিলেও পুরাতন ও নূতন পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হ'ল পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তা, ছাত্র নীরব শ্রোতা। অথচ নূতন পদ্ধতিতে ছাত্রেরাই প্রধান বক্তা, শিক্ষক তার সহায়ক মাত্র। পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষকের অবলম্বন বক্তৃতা, নূতনে প্রশ্ন। এই দুই পদ্ধতির পার্থক্য যে কোনদিন ক্লাশে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে। সুতরাং নূতন পদ্ধতির পুরোপুরি রূপায়ণ সম্ভব না হ'লেও এই মৌলিক পার্থক্যটুকু অনুশীলন ক'রে চলতে বাধা কি ? তারপর এই স্বাধীনদেশের শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে সেদিনের কি খুব দেরী আছে যেদিন শিক্ষা পরিচালনা কার্যটি সবদিক দিয়েই আদর্শের নিকটবর্তী হতে পারবে ?

সেদিন হয়ত আমরা আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিটি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব—তাই ব'লে আজো তা একেবারে ব্যর্থ নয় অন্ততঃ ভাবী সার্থকতার বীজটি আজকের এই ব্যাকুলতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় মন্তব্য হচ্ছে – এতখানি নিয়ম শৃঙ্খলা আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে গেলে পাঠদানের স্বাচ্ছন্দ্য কি বজায় থাকবে ? – পাঠদান কি যান্ত্রিক হয়ে পড়বে না ?

উত্তরে একটা পাল্টা প্রশ্ন করব—সঙ্গীতের মত এমন মনোমুগ্ধকর সহজ

সুন্দর সুকুমার শিল্প খুব কমই আছে অথচ তারো পিছনে রাগরাগিণী সুর তাল লয়ের এমন একটা জটিল নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে যে শুনলে মাথা ঘুরে যায়। সুললিত সাহিত্যের পিছনে আছে ব্যাকরণের কঠোর শাসন, চিত্রশিল্পের পিছনে বর্ণানুলেপনের এবং অস্থি ও শারীরতত্ত্বের অমোঘ নির্দেশ। এসব মেনে নিয়েও শিল্প তার নিজের সুষমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। সুন্দরীর অপরূপ দেহবল্লরীর অন্তরালে সুকঠিন অস্থি-সংস্থানের সার্থকতা কেউ অস্বীকার করবেন না—কিন্তু সেইটেই ত প্রকট হয়ে ওঠেনি মাংস মেদ বর্ণ লাবণ্য দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পই ত তাই —ভিতরে রয়েছে তার কঠোর শৃঙ্খলার শাসন, বাইরে লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। পাঠদান পদ্ধতিও একটি শিল্প—সেই শিল্পের ব্যাকরণের আলোচনাই এতক্ষণ করলাম। কারণ লাবণ্য ত শিল্পীর অন্তরের জিনিষ, তার ত ব্যাখ্যা হয় না। বিভিন্ন শিক্ষক তাকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত ক'রে, সুন্দর ক'রে' হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলবেন। সেইখানেই তাঁর শিল্পবোধ, সেইখানেই তিনি স্রষ্টা।

সবশেষে একটা কথা বলে শেষ করি। নরদেহের উপমা দিয়েছিলাম— অস্থি-সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা যতই থাক, আসল মূল্য কিন্তু প্রাণের। প্রাণহীন দেহের মূল্য কী?—পাঠদানের বেলাতেও তাই, নিয়ম শৃঙ্খলা যতই থাক সমস্তগুলিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে পাঠদানের মাধ্যমে। ছাত্র শিক্ষক মিলে যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে—পাঠ আদান প্রদানের অন্তরঙ্গতায় সংস্ত শ্রেণীটি যেখানে সজীব সেখানে ২।১টা উপকরণের ত্রুটি বা ২।১টা প্রশ্নের ত্রুটিতে কিছু আসে যায় না। মোটকথা শ্রেণীকে পাঠদানে উন্মুখ করতে হবে, জীবন্ত করতে হবে। উপরোক্ত নিয়মাবলী সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সহায়ক মাত্র, তার বেশী নয়।

———

অনুশীলনী

(১) পাঠদানের মধ্যে প্রশ্নের স্থান কোথায়? একই বিষয় পড়াইতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে যে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের প্রয়োজন হয়, তাহা কোন দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিপন্ন কর। (কঃ বিঃ, বি টি, ১৯৫০)

বিভিন্ন পাঠটীকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

[পাঠটীকা সাধারণত সাধু ভাষাতেই লেখা হয়ে থাকে। তাই পাঠটীকার এই দৃষ্টান্তগুলি সাধু ভাষাতেই লেখা হল এবং ঐ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিও সাধুভাষাতেই করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময়ে প্রশ্নগুলি যে চালত ভাষাতেই করা হবে সেকথা অবশ্য বলাই বাহুল্য]

তুলনা

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা গাহিয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশুপাখী তটিনী-তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লীজনপদে পাগল ভিখারীর সাজে
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে আসেনা নগরের মাঝে।
একদা সম্রাট কহিল, "তানসেন, তোমার গুরু সেই জন
তাঁহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ, মাগি হে তাঁর দরশন।"
এতেক কহিনৃপ ছদ্মবেশ ধরি চলিল তানসেন সাথে,
শুনিল প্রাণ ভরি বিভোর হরিদাস গাহিছে একতারাহাতে।
কহিল, "তানসেন, রাগিণী তাল লয়ে অনেক গেয়েছত গান,
আজি যা শুনিলাম তাহার মত কই আকুল করে না ত' প্রাণ ?"
কহিল তানসেন, "কাহার সাথে কার তুলনা কর হায় ভূপ,
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ ?
ভারত-ভূপ, তব আদেশমত গাই আমি এ লোক সভা মাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গান তিনি, তুলনা কি তাঁর সাথে সাজে ?"

কালিদাস রায়

কবিতার পাঠটীকা

তারিখ.....
বিদ্যালয় .....
শ্রেণী .....সপ্তম
ছাত্রসংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১২ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক—শ্রী

বিষয়—বাংলা পদ্য
পাঠপরিচয়—"তুলনা"—
শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর
অদ্যকার পাঠ সম্পূর্ণ কবিতাটি

উদ্দেশ্য ঃ নিরাসক্ত সাধক-কণ্ঠ হইতে স্বতঃউৎসারিত, ভগবৎ-উদ্দেশ্যে নিবেদিত সঙ্গীতের যে মাহাত্ম্য কবিতাটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ধ্বনি, ছন্দ ও ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে তাহার রসোপলব্ধি করিয়া ইহার কাব্য-সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য উপভোগ করিতে ছাত্রগণকে সাহায্য করা।

আয়োজন : পাঠ্য কবিতাটির মর্মানুযায়ী পবিত্র ভাব পরিমণ্ডল রচনা করিয়া উহার মূলরসের সহিত ছাত্রগণের সাহচর্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ-ভাবে পাঠের অবতারণা করা হইবে—

অসীম আকাশে পরম পুলকে
পাখী গাহে যেই গান,
জগত-পিতার স্তবগান সে বে
স্বরগের অবদান।

খাঁচার পাখীটি সদা বুলি বলে
তুষিতে পালক মন,
সে— তোষণ ভাষণে মিলিবে কেমনে
পরাণের পরশন ?

কবিতাটি বলিয়া নিম্নরূপ প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের সূচনা করা হইবে :—

(১) আকাশে উড়িয়া উড়িয়া পাখী যে গান গাহে তাহার স্বরূপ কি ?

২) খাঁচার পাখী বুলি বলে কেন ?

(৩) খাঁচার পাখীর বুলিতে প্রাণের স্পর্শ নাই কেন ?

(৪) মুক্তপাখীর গান খাঁচার পাখীর বুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ?

পাঠঘোষণা : সাধক হরিদাস যে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভগবৎ চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন সে সঙ্গীতের মনোহারিতা ও মাহাত্ম্য অপার সঙ্গীত বিশারদ দিল্লীপতি আকবরের সভাগায়ক তানসেনের সঙ্গীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আজ আমরা কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'তুলনা' নামক কবিতা হইতে উপলব্ধি করিব।

উপস্থাপন : (ক) প্রথমতঃ মূলভাব ও রসের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাযথ ধ্বনি ও ছন্দোবিন্যাসে শিক্ষক কবিতাটির একটি আদর্শ পাঠ দিবেন এবং ছাত্রেরা ইহার মর্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন :—

(১) সাধক হরিদাস কোথায় কি ভাবে গান গাহিয়া ফিরিতেন ?

(২) তাঁহার গান শুনিয়া সম্রাট তানসেনকে কি বলিলেন ?

(৩) তানসেন তাহার উত্তরে সম্রাটকে কি বলিলেন ?

(খ) এইবার শিক্ষক সমগ্র পাঠটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পাঠ করিবেন এবং নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের সহযোগিতায় পঠিত অংশের মূলভাব, সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য এবং দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের আলোচনা করিবেন :—

প্রথম অংশ (কবিতাটির প্রথম ছয় পংক্তি) পাঠ ও প্রশ্ন :—

(১) হরিদাসের গান কাহারা শুনিত ?

(২) তিনি কোথায় কি সাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ?

(৩) এখানে 'দর্শন' পদটির পদ্যে কি রূপ দেওয়া হইয়াছে ?

(৪) সাধক হরিদাস একতারা বাজাইয়া গিরিবনে গাহিয়া ফেরে—এই বাক্যটি পদ্যে কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

(৫) দ্বিতীয় চরণে কোন্ কোন্ ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হইতেছে ?

(৬) কোন ধ্বনি বারবার আবৃত্ত হইয়াছে, এমন কোন কবিতাংশ বল।

তুলনীয় : ["চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ,
কোথা চম্পক আভরণ।"]

["গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।" রবীন্দ্রনাথ]

(৭) কবিতায় একই ধ্বনি বার বার ব্যবহার করা হয় কেন ?

[প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক বলিয়া দিবেন—কাব্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। এক ধ্বনি বারবার যোজিত হওয়াকে "অনুপ্রাস" অলঙ্কার বলে]

(৮) নিম্নলিখিত অর্থ বুঝাইতে এখানে কোন কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ?

নদী ; বৃক্ষ ; লোকালয়।

দ্বিতীয় অংশের (কবিতাটির শেষ আট পংক্তি) পাঠ ও প্রশ্ন :—

(১) সম্রাট কি বেশে তানসেনের সাথে চলিলেন ?

(২) হরিদাসের গানকে "গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী" বুঝাইলে, "রুদ্ধবারি কূপ" বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে ?

(৩) তানসেন নিজের গানকে "রুদ্ধবারি কূপ" বলিতেছেন কেন ?

(৪) তানসেন কাহার আদেশে গান করিতেন ?

(৫) হরিদাস কাহার সভায় গান করেন—বলিয়া তানসেন উল্লেখ করিয়াছেন ?

(৬) এখানে "তুলনা" পদটির পদ্যরূপ কি দেওয়া হইয়াছে ?

(৭) "তুলা" শব্দের এইরূপ ব্যবহার দেখাও।

[তুলনীয় : ("কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥)]

(৮) নিম্নরূপ অর্থ বুঝাইতে কবি এখানে যে যে পদ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি বল :—

বাহ্যজ্ঞানশূণ্য ; স্বর্গের গঙ্গা ; হিমালয়স্থ গঙ্গার উৎপত্তি স্থল।

(গ) এইবার শিক্ষক কবিতাটির অংশ বিশেষ কয়েকটি ছাত্রকে ধ্বনি ও ছন্দসহ যোগে পড়িতে বলিবেন এবং নিম্নরূপ ছন্দোবিন্যাসে শুদ্ধভাবে পড়িতে তাহাদের সাহায্য করিবেন—

সাধক হরিদাস। বাজায়ে একতারা। গাইয়া ফেরে গিরি। বনে।
বনের পশুপাখী। তটিনী-তটশাখী। তাহার সঙ্গীত। শোনে।

এখানে প্রত্যেকটি চরণে ৩টি পূর্ণ পর্ব ও ১টি খণ্ড পর্ব পৌনঃপুনিকভাবে আবৃত্ত হইতেছে ; পর্বগুলি ৭ মাত্রার এবং প্রত্যেক ৪ পর্বযুক্ত দীর্ঘ চরণের শেষে পূর্ণ যতি আছে।

অভিযোজন ঃ (কাব্যপাঠের সার্থকতা বিচার) ছাত্রেরা কবিতাটির মর্ম ও রস সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হইবে :—

(১) হরিদাস 'রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে' আসিতেন না কেন ?

(২) হরিদাসের গান শুনিবার জন্য নৃপ ছদ্মবেশ ধরিলেন কেন ?

(৩) তানসেনের গানে "রাগিণী-তাল-লয়" থাকা সত্ত্বেও তাহা সম্রাটের প্রাণ আকুল করিল না কেন ?

(৪) গুরুর গানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য তানসেন উহাকে কিসের সহিত উপমা দিয়াছেন ?

(৫) তানসেন কি কারণে বলিয়াছিলেন যে, গুরুর গানের সহিত তাঁহার নিজের গানের তুলনা সাজে না ?

(৬) ভারত-ভূপ আমি তোমার আদেশ মত এ লোক সভা মাঝে গাই—বাক্যটির পদ্যরূপ কি হইবে ?

(৭) কবিতাটির মর্মার্থটি সহজ ভাষায় বল।

বাড়ীর কাজ ঃ "বিশ্ব-ভূপালের সভায় গান তিনি,"—এই কথাটির তাৎপর্য্য নিজের ভাষায় বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে।

———

ব্যাকরণ-পাঠটীকা

তারিখ—
বিদ্যালয়—
শ্রেণী—৬ষ্ঠ
গড়বয়স—১১ বৎসর
ছাত্র সংখ্যা—৩০
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক—শ্রী

বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ
পাঠক্রম—বর্ণ প্রকরণ :—
(ক) বর্ণ ও ধ্বনি
(খ) সন্ধি প্রকরণ
(i) স্বর সন্ধি (প্রথম চারিটি সূত্র)
(ii) স্বর সন্ধি—(অবশিষ্ট সূত্র)
(গ) ব্যঞ্জন সন্ধি
(ঘ) (i) অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য—মুখ্য :—বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ও তাহার সূত্রাবলীর যথাযোগ্য প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করা—

গৌণ :—ছাত্রদিগের চিন্তা যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশে সাহায্য করা—

আয়োজন :—ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা পূর্বক বর্তমান পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(ক) বাংলা বর্ণমালায় কয়টি বর্ণ, বর্ণগুলি কয় ভাগে বিভক্ত ?
(খ) 'বিদ্যালয়'—শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে কি কি বর্ণ পাওয়া যায় ?
(গ) ইহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ কোন গুলি ও ব্যঞ্জনবর্ণ কোন গুলি ?
(ঘ) সন্নিহিত পদ দুইটীর অন্তর্গত কোন কোন বর্ণ এখানে মিলিত হইয়াছে ?
(ঙ) দুইটী যুদ্ধরত জাতির মিলনকে সাধারণতঃ কি বলে ?

পাঠঘোষণা :—"এইভাবে দুইটি স্বতন্ত্রপদের অন্তর্গত সন্নিহিত বর্ণদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। মিলিত বর্ণদ্বয় স্বরবর্ণ হইলে স্বরসন্ধি ও ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে হয় ব্যঞ্জন সন্ধি।

—"আজ আমরা স্বরসন্ধির প্রথম চারিটি নিয়ম ও প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাদের সূত্র নির্মাণের জ্ঞান অর্জন করিব—"

—এই বলিয়া শিক্ষক অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন ঃ—পাঠ্যাংশটি নিম্নানুরূপ চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষক অদ্যকার পাঠ পরিচালনা করিবেন—

(i) শিক্ষক প্রথমে নিম্নলিখিত পদগুলি বোর্ডে লিখিয়া অদ্যকার আলোচনা সুরু করিবেন—

নরাধম, কুশাসন, মহারণ্য, জলাশয়, বিদ্যালয়—উল্লিখিত পদগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া স্বরসন্ধির সাধারণ সূত্রটি আবিষ্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে—

(১) এই পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে কি কি শব্দ পাওয়া যায় ?

(২) ওই সব শব্দযুগলের মধ্যে কোন কোন বর্ণের মিলন ঘটিয়াছে ?

(৩) এই মিলনের ফলে কোন কোন বর্ণের কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে ?

পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন

নর (অ)+(অ) ধম = নর (আ) ধম = নরাধম
কুশ (অ)+(আ) সন=কুশ (আ) সন=কুশাসন
মহ (আ)+(অ) রণ্য=মহ (আ) রণ্য=মহারণ্য
জল (অ) + (আ) শয়=জল (আ) শয়=জলাশয়
বিদ্য (আ)+(আ) লয়=বিদ্য (আ) লয়=বিদ্যালয়

(৪) অ-কার বা আ-কারের পরে অ-কার বা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে ?

(ক) অতঃপর সূত্র নিষ্কাশণ করিয়া শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দিবেন—

—অ-কার কিম্বা আ-কারের পর অ-কার কিম্বা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়। ঐ আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ii) ১ম ভাগে বর্ণিত অনুরূপ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রদের সহায়তায় সূত্রনিষ্কাশণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে—

যত (ই)+(ই) ন্দ্র=যত (ঈ) ন্দ্র=যতীন্দ্র
মন (ই)+(ঈ) শ=মন (ঈ) শ=মনীশ
পর (ই)+(ঈ) ক্ষা=পর (ঈ) ক্ষা=পরীক্ষা
যোগ (ঈ)+ (ঈ) শ্বর=যোগ (ঈ) শ্বর=যোগীশ্বর

(খ) ই-কার বা ঈ কারের পর ই-কার বা ঈ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয়। ঐ ঈ-কার পূর্ব্ব বর্ণ যুক্ত হয়।

(iii) কট (উ)+(উ) ক্তি=কট (উ ক্তি= টক্তি
লঘ (উ)+ উ) র্মি=লঘ (উ) র্মি = লঘুর্মি

(গ) উ-কার বা উ-কারের পরে উ কার বা ঊ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊকার হয়। ঊ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(iv) যথ (আ) + (ই) ষ্ট=যথ (এ) ষ্ট=যথেষ্ট
পর (অ) + (ঈ) শ=পর (এ) শ=পরেশ
মহ (আ)+ (ঈ) শ=মহ (এ) শ=মহেশ

(ঘ) অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয়। ঐ এ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

বোর্ডের কাজ—পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সহযোগিতায় শব্দ বিশ্লেষণ পূর্বক সন্ধির সূত্র রচনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে।

অভিযোজন—ছাত্রেরা অদ্যকার পাঠ কি পরিমাণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ও সন্ধি সম্বন্ধীয় সূত্রপ্রয়োগের অনুশীলন করাইবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হইবে—

(১) নবীন ধান্যে হবে নবান্ন
(২) হিমালয়ের শোভা অপূর্ব
(৩) মনদিয়া বিদ্যার্জন করিবে
(৪) মহেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন
(৫) রমেশকে ডাকিয়া দাও
(৬) কাহাকেও কটূক্তি করিও না
(৭) বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন

এই বাক্যগুলির মধ্যে কোন কোন শব্দ সন্ধিযুক্ত হইয়াছে ?
কোন কোন শব্দযুগলের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে ?

নিম্নের বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে সন্ধিবদ্ধ কর—
গ্রন্থ + আগার, চরণ + অমৃত, মহা + অর্ণব, পরম + ঈশ্বর, মহা + ইন্দ্র
কোন কোন সূত্র অনুসারে শব্দগুলি সন্ধিযুক্ত হইয়াছে।

বাড়ীর কাজ—তোমাদের সাহিত্য পুস্তকের যে কোন একটি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া তাহার প্রথম অনুচ্ছেদে কোন কোন শব্দগুলি স্বরসন্ধিযুক্ত হইয়াছে তাহা বাছিয়া বাহির কর এবং তাহাদের সূত্র গুলি লিখ।

———

দ্রুত পঠন কাহিনীর পাঠটীকা

তারিখ—
বিদ্যালয়—
শ্রেণী—৯ম শ্রেণী
গড় বয়স—১৪ বৎসর
ছাত্র সংখ্যা—৩০
সময়—৪০ মিঃ
শিক্ষক—শ্রী

বিষয়—বাংলা দ্রুত পঠন
বিশেষ বিষয়—"ছুটি" গল্প
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উদ্দেশ্য—(ক) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "ছুটি" গল্পের রসাস্বাদনে ছাত্রদের সহায়তা করা—

(খ) ছুটি গল্পের সহায়তায় ছাত্রদের সাহিত্য প্রীতির উন্মেষ সাধন ও ছোট গল্পের সাহিত্য মূল্যবোধ সহায়তা করা—

আয়োজন—তরুণ শিক্ষার্থীর মন অদ্যকার পাঠাভিমুখী করার উদ্দেশ্য শিক্ষক শিক্ষানুকূল প্রশ্নগুচ্ছ করিবেন—

(১) কোন কোন ছোট গল্প তোমরা পড়িয়াছ?

(২) রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত ছোট গল্পের বইএর নাম কর।

(৩) তোমরা যাহারা দূরের গ্রাম হইতে পড়িতে আস তাহারা স্কুলের দীর্ঘ ছুটির বা অবকাশের সময় কোথায় যাইতে চাও?

(৪) কোন একটি ছোট ছেলে যদি তাহার ঘর বাড়ী পিতামাতা ছাড়িয়া বিদেশে পড়াশুনার জন্য পড়িয়া থাকে তবে ছুটি পাইলে সে কোথায় যাইতে চাহিবে?

(৫) আজকে আমাদের ছুটিরে ভাই
আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি॥

কবিতাংশটিতে শিশুমনের কোন ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে ?

পাঠঘোষণা—ছুটির প্রতি শিশুর আগ্রহ স্বাভাবিক। স্কুলের বন্দীদশা থেকে শিশু চায় মুক্তি—সে যেতে চায় নিজের বাড়ীতে, যেখানে আছে তার স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় পিতা—অন্যান্য পরিবার পরিজন। কিন্তু যদি কোন কারণে শিশুর এই মিলনের পথটি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, ছুটির পরেও যদি তাকে পিতামাতার স্নেহময় সান্নিধ্য থেকে শান্তিময় গৃহপরিবেশ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হতে হয় তাহলে শিশুর মন ভরে যায় গভীর বেদনায়। সেই বেদনা আরো উগ্র হয়ে ওঠে যদি এই পরিস্থিতি তার উপর অকারণ অত্যাচার উৎপীড়ন চালান হয়। শিশুমন তাতে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ছুটির মধ্যে ছুটির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা একান্ত বিষময় হয়ে দেখা দেবে। কিশোর মনের এই বিষময় বেদনা যে কতখানি করুণ ও মর্ম-স্পর্শী হতে পারে তার একখানি অনবদ্য ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছুটি" নামক একটি ছোট গল্পে। সেই গল্পটি পাঠ করে আজ আমরা দেখব তরুণ বালক ফটিকের বন্দী জীবনের কারুণ বেদনা কবির অমর লেখনী স্পর্শে কেমন সর্বজনীকরূপ লাভ করে সার্থক হয়েছে—" এই বলিয়া শিক্ষক অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

(দ্রুত পঠনের পাঠদানকালে পাঠ ঘোষণাটি একটু বিস্তৃতভাবে করিয়া কাহিনীর মূল বক্তব্যটির প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ভাল হয়।)

উপস্থাপন—শিক্ষক সমগ্র গল্পটি শ্রেণীর সকল ছাত্রকে দ্রুত ও নীরবে পাঠ করিতে বলিবেন। পাঠের সময়ে গল্পের মূল বিষয়গুলি এবং কেন্দ্রীয় ভাবটি যাহাতে ছাত্রেরা ভালভাবে অনুসরণ করিতে পারে সেজন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রেরা বোর্ডে লিখিত বিষয় শীর্ষের ভিত্তিতে কাহিনীটি নীরবে দ্রুত পাঠ করিবে।

(১) ফটিকের খেলার প্রতি আগ্রহ
২) মামার আগমন ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন
(৩) মামার বাড়ীতে ফটিকের মানসিক অস্বস্তি ও তাহার কারণ
(৩) কিশোর বয়সের ধর্ম
(৫) বাড়ী ফিরিবার জন্য ফটিকের আগ্রহ
(৬) ফটিকের অসুস্থতা ও প্রলাপ

(৭) খালাসিদের জলমাপার অভিজ্ঞতা ও ফটিকের জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া

(৮) ছুটি কথার বিশেষ অর্থ

অভিযোজন—নীরব পাঠ শেষ হইলে ছাত্রেরা দ্রুত পঠনের দ্বারা হাস্যের ভাব ও আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা পরীক্ষার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হইবে।

(১) গ্রাম্য বালক ফটিকের প্রকৃতি কেমন ছিল ?

(২) কিশোর বয়স্ক ফটিকের মনের ভাব কিরূপ ?

(৩) মামার বাড়ীতে ফটিক শান্তি পাইল না কেন ?

(৪) "—এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—" ফটিকের জীবনে একথার তাৎপর্য কি ?

(৫) 'ছুটি' কথাটি এখানে কি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ?

বাড়ীর কাজ—ছুটি গল্পটি পড়িয়া ছাত্রদের কেমন লাগিল, শিক্ষক সেই সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

———

রচনার পাঠ টীকা

তারিখ
বিদ্যালয়—
শ্রেণী— ৬ষ্ঠ
গড় বয়স—
ছাত্র সংখ্যা—৩০
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক—শ্রী

বিষয়—বাংলা রচনা
বিশেষ পাঠ—বসন্তকাল

উদ্দেশ্য - মুখ্য—বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা সুস্পষ্ট করিয়া সরল ভাষায় সুসংবদ্ধভাবে রচনা লিখিতে সহায়তা করা। গৌণ—ভাষা ব্যবহার, রচনা শক্তি কল্পনা যুক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা।

আয়োজন—ছাত্রদের মন অদ্যকার রচনার বিষয়বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ভূমিকা প্রসঙ্গে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হইবে।

(১) কোকিল কাল, কাকও কাল। তবু আমরা কোকিলকে ভালবাসি কেন?

(২) কোকিলের ডাক কোন সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়?

(৩) বৎসরে কয়টি ঋতু? ঐ সময়টি কোন ঋতুর অন্তর্ভুক্ত?

(৪) কি কি মাস লইয়া বসন্তকাল হয়?

পাঠঘোষণা—আজ আমরা বসন্তঋতু সম্বন্ধে রচনা লিখিতে শিখব এই বলিয়া শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন - ছাত্রদের নিকটে অদ্যকার পাঠটি সহজ করিবার উদ্দেশ্যে এবং পাঠ পরিচালনার সুবিধার্থ শিক্ষক বিষয়টিকে ছাত্রদের সহযোগিতায় কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করিয়া লইবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের সহায়তায় প্রতিটি শীর্ষের আলোচনা করিবেন।

(ক) ভূমিকা—

ফাগুনের নবীন আনন্দে,
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি
তার দিল বকুলের গন্ধে।

এই কবিতার কবি কোন ঋতুর আবাহন করিয়াছেন ?

(২) কোন ঋতুর পর বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয় ?

(৩) এই দুই ঋতুর আবহাওয়ার পার্থক্য কি রূপ ?

(৪) এই ঋতুতে কোকিলের কলগীতি এবং বকুলের গন্ধের কথা বলা হইয়াছে কেন ?

(খ) প্রাকৃতিক শোভা—

(১) "পাতা ঝরানোর সময় হয়েছে শুরু—" কোন সময়ের কথা বলা হইয়াছে।

(২) "জীর্ণ পাতা যাবার বেলা বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
একথা বলার তাৎপর্য কি ?

(৩) নূতন পাতায় আর ফুলে গাছ যখন ভরে ওঠে তখন প্রকৃতির শোভা কেমন হয় ?

(৪) বসন্তকালে কি কি ফুল ফোটে ?

(৫) এ সময়ে আকাশের শোভা কেমন হয় ?

(৬) কোন পাখীর ডাক এসময় বেশী শোনা যায় ?

(৭) এসময়ে বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় ?

(গ) মানব মনে বসন্তকালের প্রভাব—

(১) বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করো না বিড়ম্বিত তারে—
একথা বলার উদ্দেশ্য কি ?

(২) রসিক কবি ও গায়কের চিত্ত এসময়ে পুলকিত হয় কেন ?

(৩) বসন্তকে ঋতুর রাজ বলা হয় কেন ?

(৪) বসন্তকালে কোন কোন উৎসব হয় ?

(৫) ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোল পূর্ণিমা বলা হয় কেন ? তখন কি উৎসব হয় ?

(ঘ) সাংসারিক ক্ষেত্রে বসন্তকালের প্রভাব—

(১) এই সময় কোন কোন ফসল হয় ?

(২) চাষীদের অবস্থা এসময়ে কেমন থাকে ?

(৩) বর্ষাকালের বৃষ্টি বা শীতকালের হিম না থাকায় কাজকর্মের দিক দিয়া এসময়টি কেমন ?

(৪) যাতায়াতের দিক দিয়া এসময় কেমন ?

(ঙ) সুবিধা ও অসুবিধা—

(১) "কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি—"

—এখানে কি কি অর্থে বসন্ত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(২) বসন্তকালে কি কি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ?

(৩) সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?

(৪) "বসন্তের এক হাতে হাসির ডাল।

অন্য হাতে অশ্রুর মালা—"একথা বলা হয় কেন ?

অভিযোজন—

উল্লিখিত নির্দেশ অনুসারে (খ) শীর্ষটি (প্রাকৃতিক শোভা) সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করিতে বলা হইবে। লিখিবার সময়ে শিক্ষকশ্রেণী কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রদের কার্য পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ব্যক্তিগত ভাবে যথাসম্ভব তাহাধের সাহায্য করিবেন।

বাড়ীর কাজ—

সমগ্র রচনাটি বাড়ী হইতে সুন্দর করিয়া লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

(১) রচনাটিকে বিভিন্ন শীর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি শীর্ষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া লিখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে একটি শীর্ষের ভাব অন্য শীর্ষে যেন সংক্রামিত না হইয়া যায়।

(২) রচনার ভাব যথাসম্ভব স্পষ্ট সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) বানান শুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন।